শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ

বিনয় ঘোষ

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ : কলকাতা ৭৩



প্রথম সংস্করণ
মে ১৯৪০
দ্বিতীয় সংযোজিত-সংস্করণ
জুলাই ১৯৮০
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রাকর
দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

উৎসর্গ

প্রথম মুদ্রণ ১৯৪০ / নতুন সংস্করণ ১৯৮০

বৈজ্ঞানিক সুচিন্তা যাঁদের অগ্রগতির পথে
একমাত্র অস্ত্র
মানুষের শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজের ক্রমবিকাশে
যাঁরা বিশ্বাস করেন
নিজেদের সংগ্রামে নির্ভীক হয়েও যাঁরা
অসমসাহসিক নন
আত্মবিশ্বাসী হয়েও যাঁরা
কল্পনাবিলাসী নন
ভবিষ্যতের শ্রেণীশূন্য সমাজ গঠনের গুরুভার
যাঁদের উপর ন্যস্ত
বাংলা দেশের সেই পুরোগামী বিপ্লবী
সেনাবাহিনীকে দিলাম

সহযাত্রীর ও সহকর্মীর আন্তরিক অর্ঘ।

স্বীকৃতি ১৯৪০

বন্ধু শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়, সুবোধ চৌধুরী, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথনাথ সান্যাল, পুলকেশ দে সরকার, পরেশনাথ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, শুভেন্দু ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, এঁরা আমার সঙ্গে কয়েকটি বিষয় একত্রে আলোচনা করে যে-উৎসাহ দিয়েছেন, তার জন্যে সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার, প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির উল্লেখ করে রচনা সমৃদ্ধ করবার জন্য আমাকে যথেষ্ট অবকাশ দিয়েছেন। কতদূর তাঁদের উপদেশ পালন করতে পেরেছি জানি না, তবু তাঁদের কাছে আমার ঋণ অস্বীকার করবার নয়।

স্বীকৃতি ১৯৮০

তরুণ বন্ধুরা যাঁরা গত তিন-চার বছর ধরে এই বইখানি পুনর্মুদ্রণের জন্য ক্রমাগত আমাকে অনুরোধ করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সূচী

ভূমিকা ১৯৪০

রিচার্ডস্ বলেন যে "Over whole tracts of natural emotional response we are to-day like a bed of dahlias whose sticks have been removed". আজ আমাদের কোনোকিছুতে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাসকে আমরা মন থেকে দ্বীপান্তর দিয়েছি। মরুভূমির মতো শূন্য মন ধূ ধূ করছে। অবিশ্বাস আজ শিল্পীর মনকে আত্মসাৎ করেছে, ইয়েটস্-এর ভাষায়, "Mere anarchy is loosed upon the world". কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই অবিশ্বাসের প্রেতপুরী থেকে শিল্পী বিশ্বাসের কোনো শ্যামলভূমির সন্ধান পেতে পারেন কিনা? এ-প্রশ্নের উত্তর আজ সমস্ত লেখকেরাই দাবী করবেন, কারণ তাঁরা শুধু জীবনধারণের জন্য মুক্ত আলোবাতাস চান না, সত্য কিছু প্রকাশ করতে চান, জীবন্ত সত্য, মঙ্গলময়, সুন্দর সত্য। তাই আজ যে-নৈরাশ্যের বা অবিশ্বাসের প্রাসাদ আমাদের মাথার উপর ধসে পড়ছে, তার সেই ধসে পড়াটাকেই সত্য ভেবে হতবাক্ হয়ে থাকলে আমাদের চলবে না, বুঝতে হবে কিসের আঘাতে আজ এই ভাঙন শুরু হল, যে-ভাঙন শুধু যে বহির্জগৎকেই চুরমার করল তা নয়, মনের মধ্যেও ভীষণ তোলপাড় করে দিল। তা যদি বুঝতে পারি তাহলে আবার বিশ্বাস আমরা ফিরে পাব, সত্যের সন্ধান পাব, আমাদের কণ্ঠোৎসারিত সঙ্গীত নৈশ স্তব্ধতায় জনশূন্য পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্যে প্রেতের কান্নার মতো ভয়ঙ্কর-করুণ শোনাবে না।

শিল্পী মানুষ। মানুষ বলেই তিনি তাঁর জীবনকে অবহেলা করতে পারেন না। গারদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে উন্মাদের প্রলাপ বকবার অধিকার আছে, আত্মতৃপ্তির জন্য যা-খুশি করবার ফুরসৎ আছে, কিন্তু সমাজের মধ্যে বাস করে আর যাই থাক, এই উন্মাদের মতো আত্মতৃপ্তির অবাধ স্বাধীনতা মানুষের নেই। 'শিল্পের খাতিরে শিল্প' উন্মাদের প্রলাপ ভিন্ন কিছু না। 'খাওয়ার খাতিরে খাওয়া', 'চলার খাতিরে চলা' প্রভৃতির প্রলাপের অর্থ নিয়ে আশ্রমবাসী সমালোচকেরা গবেষণা করতে পারেন, কিন্তু আমরা এ-সব উপেক্ষা করব শুধু মানুষ বলে। শিল্পী জীবনকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না বলেই জীবনের প্রতি তাঁর নির্দিষ্ট কোনো মনোভাব থাকা স্বাভাবিক। তিনি যে-সমাজে বাস করেন, যে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে জীবনকে দেখতে পান, সেই সমাজ, সভ্যতা ও

সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ কোণ থেকেই তিনি দেখবেন। জীবনের প্রতি শিল্পীর এই মনোভাবই হচ্ছে সব চেয়ে বেশি মূল্যবান। এই মনোভাবই শিল্পে ও সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়।

জীবন, সমাজ, মানুষ প্রভৃতি কোনোকিছুকেই যারা মূল্য দেন না, সব ভূয়ো, অর্থহীন বলে প্রকাশ করেন, সেই সব ছন্নছাড়া কয়েকজন individual-anarchist-দের বাদ দিলে, বাকি যাঁরা থাকেন, তাঁদের বিশেষ কিছু ব্যক্ত করবার থাকে। বিশ্বাসই তাঁদের প্রধান সহায় হয়। জীবনের প্রতি যে-কোনো কারণেই হোক তাঁদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকবেই। তাঁদের মন কোনোদিন শ্মশানে পরিণত হয় না। তাঁরা যে-যুগে বাস করেন, সে-যুগের সত্যের চারণ সেইজন্য তাঁরাই হন। তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রকাশ করেন না। তাঁরা রূপায়িত করেন "the whole life of the time," যুগের জীবন। যুগের জীবন অনুভব করে শিল্পী যখন প্রকাশ করেন তখন তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেরও পূর্ণ বিকাশ হয়, কারণ যুগজীবন বহুমুখী বিচিত্র ধারার সমন্বিত প্রবাহ ভিন্ন কিছু নয়, এঙ্গেলস্ যাকে বলেছেন "one resultant—the historical event" এবং "each contributes to the resultant and is to this degree involved in it".

বর্তমানের এই নৈরাশ্য ও অবিশ্বাস-কলুষিত প্রতিবেশের মধ্যে শিল্পী সেইজন্য বাস করতে পারেন না। বিশ্বাস তাঁর চাই-ই। সে-বিশ্বাসের জন্য আজ হয় তাঁকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে অতীতের দিকে, তা না হলে দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর দায়িত্ব অনেক। ধনতন্ত্রের সে গৌরবময় শৈশব বা যৌবন আজ আর ফিরে আসতে পারে না, শুধু তার নকল রূপ আমরা পেতে পারি। নকল রূপ হবে আরো বীভৎস —ফ্যাশিজম্—"Literary Fascism goes with Political Fascism"। নিরপেক্ষ থাকাও সম্ভব নয়। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি আমাদের তাই মেলতেই হবে। কবি সিসিল্ ডে-ল্যুইস্ বলেছেন

Yet living here,
As one between two massive powers I live
Whom neutrality cannot save
Nor occupation cheer.

None such shall be left alive :
The innocent wing is soon shot down
And private stars fade in the blood-red dawn
Where two worlds strive.

The red advance of life
Contracts pride, calls out the common blood,
Beats song into a single blade,
Makes a depth-charge of grief.
Move then with new desires,

For where we used to build and love
Is no man's land, and only ghosts can live
Between two fires.

দুটি জগতের অস্তিত্বকে কবি স্বীকার করছেন। বিরোধী দুটি জগৎ হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামেরই রূপ, বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব এতো জটিল যে নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব। যে-কোনো একদিকে যোগ দিতেই হবে। ডে-ল্যুইস্ "The red advance of life"-এর দিকে ঝুঁকেছেন, কারণ তিনি মনে করেন "only ghosts can live between two fires".

এই কবিতায় সাম্যবাদকে সমর্থন করা হয়েছে, সুতরাং অনেকে বলবেন প্রপাগ্যাণ্ডা। কিন্তু সাম্যবাদ বা অন্য কোনো "—বাদ" কিনা, প্রশ্ন তা নয়। যে-সত্য আজ আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে-সত্য, অর্থাৎ আমরা দেখব আমাদের যুগজীবন ঠিক ব্যক্ত হয়েছে কিনা। আমরা দেখেছি যে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতাই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্যের উৎস। আজ সেই ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা, এককথায় মানুষের জীবনের সৌন্দর্য ও শান্তি যখন ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কবলে পড়ে ধ্বংসোন্মুখ, তখন একমাত্র সাম্যবাদই তাদের পুনরুজ্জীবনের আশা দিচ্ছে। সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় লোপ পাবে, জাতিতে জাতিতে স্বার্থের সংঘাতে যুদ্ধ বাধবে না, মানুষের সামনে মানুষ সংস্কৃতির ও সভ্যতার প্রাচীর তুলবে না, হীন প্রতিযোগিতা

দূর হয়ে যাবে, মানুষের স্বাধীনতা ফিরে আসবে। আজ বিশ্বাস তাই একমাত্র ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে ফিরে পাওয়াই সম্ভব। পৃথিবীর বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী শ্রমজীবী-শ্রেণী আজ সেই বিশ্বাসে বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে। আজকের জীবনের 'elemental forces' এইগুলি, এই শ্রেণী-বিরোধ, ভবিষ্যতের শ্রেণী-শূন্য সমাজে বিশ্বাস, এবং লেনিনের মতে শিল্পীর কর্তব্য জীবনের 'elemental force'-গুলিকে ব্যক্ত করা।

এই বইয়ের মধ্যে এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি। উপাদান সংগ্রহ করেছি ইংরেজী সাহিত্য থেকে দুটি কারণে। প্রথমত সব দেশের সাহিত্য আলোচনা করবার শক্তির অভাব, দ্বিতীয়ত ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে এ-দেশের যোগাযোগ খুব বেশি, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের, এবং সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের। পৃথকভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা অন্য খণ্ডে করবার ইচ্ছা রইল। 'অষ্টম' ও 'নবম' অধ্যায় দুটি সম্পূর্ণ আলোচনা হিসাবে না পড়ে, ভূমিকা হিসাবে পড়তে হবে।

৭ই মে, ১৯৪০
কলকাতা

বিনয় ঘোষ

ভূমিকা ১৯৮০

১৯৪০ সালে 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি লিখি। প্রবন্ধের বিষয়গুলি নন্দনতত্ত্ব সাহিত্য কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি। এগুলি যে গুরুগম্ভীর বিষয় তা সকলেই স্বীকার করবেন। লেখকের বয়সের দিক থেকে এইসব বিষয় নিয়ে এমনিতেই সাধারণভাবে আলোচনা করা অনেকের কাছে অনধিকারচর্চা বলে মনে হবে। বাস্তবিকই তাই। প্রথমত ১৯৩৮-৩৯ সালের একটি কুড়ি বছরের তরুণের সঙ্গে ১৯৮০-৮১ সালের একটি কুড়ি বছরের তরুণের পার্থক্য বিরাট। সুশিক্ষিত তরুণদের কথাই বলছি। বর্তমানকালে এই বয়সের তরুণদের বিদ্যাবুদ্ধি-প্রতিভা অনেক বেশি প্রখর ও বহুমাত্রিক। সেটা অবশ্য সামাজিক গতিবেগের চাপেই হয়েছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের একজন তরণের বোধবুদ্ধির এতটা প্রখরতা ও ব্যাপকতা থাকার কথা নয়। সেই কথা মনে করে বিচার করলে এইসব বিষয় নিয়ে লেখা সত্যিই অনধিকারচর্চা বলে মনে হয়। তাও আবার লেখার জন্য লেখা নয়, যেনতেন প্রকারে সাহিত্য-শিল্প নিয়ে 'সাহিত্যিক' আলোচনা নয়। লেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই দৃষ্টিটাও আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক দৃষ্টি নয়, মার্কসবাদসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। তার জন্য অনধিকার ও দুঃসাহসের মাত্রা স্বভাবতঃই অনেক বেড়ে গিয়েছে। বর্তমানে যেমন যতজন 'মার্কসবাদী' আছেন প্রায় ততরকমের 'মার্কসবাদ' গজিয়ে উঠেছে. ১৯৩০-এর দশকে, আমাদের 'টীনএজ' থেকে তারুণ্যে ও যৌবনে উত্তীর্ণ হবার কালে, ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এরকম বিতর্কবাণে শতছিন্ন বস্ত্রের মতো মার্কসবাদের অবস্থা হয়নি। তখনকার মার্কসবাদ তাৎকালিক ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রতিবেশে একটা নিটোল পরিপূর্ণ আদর্শ ছিল। সেই আদর্শে আমরা কিশোর-তরুণ বয়স থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। আজ সেকথা গভীর বিষণ্ণতার মধ্যেও ভাবতে ভাল লাগে, এমনকি বেশি বয়সেও রোমাঞ্চ হয়।

মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্টালিন মাও-সে তুঙ প্রমুখ মনীষীদের রচনা আমরা তখন ক্লাস পালিয়ে অথবা ক্লাসের পেছনের বেঞ্চে বসে পড়তাম। দু'একজন যারা বইপত্র সরবরাহ করত তারা গোপনে কাগজে জড়িয়ে সেগুলি নিয়ে আসত। বাড়িতেও পাঠ্যবই ফেলে সেগুলি নিশ্চিন্তে পড়া সম্ভব হত না।

এই অবস্থায় ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত 'মার্কস্ইজম' পড়েছি। সুতরাং তার বিদ্যা কতদূর পর্যন্ত গভীর হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তার সঙ্গে সাহিত্যপাঠ তো আছেই এবং সাহিত্য বলতে তখন আমাদের কাছে বামপন্থী তো বটেই, মার্কসবাদী লেখকদের রচিত সাহিত্যেরই আবেদন ছিল সবচেয়ে বেশি। সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় তখন আমাদের 'মডেল' লেখক ছিলেন কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স, অডেন, স্পেণ্ডার, ডেল্যুইস এবং আরও দু'-চারজন। কড্ওয়েল, ফক্স এঁরা স্পেনের ফ্যাশিস্টবিরোধী গৃহযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামও করেছেন, কেউ-কেউ প্রাণও দিয়েছেন। কাজেই তাঁরা যে আমাদের সাহিত্যজীবনের আদর্শ হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, বিশেষ করে তরুণ সাহিত্যিকদের কাছে।

শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজের সমস্ত রচনা এঁদের রচনা পড়ে লেখা। মার্ক্স-বাদই হোক অথবা এঁদের লেখাই হোক, পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তখন হয়নি। একথা স্বীকার করতে কোনো সংকোচ নেই, দ্বিধাও নেই। কিন্তু অপরিণত বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এই লেখকের বইখানি যখন প্রকাশিত হল, তখন তরুণ ছাত্রমহলে বিশেষ করে তার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। লেখক হিসেবে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তখনকার দিনে তিন টাকার বই, এবং প্রবন্ধের বই, এবং নীরস প্রবন্ধের বই, খুবই দুর্মূল্য ছিল। তৎসত্ত্বেও, আমার মনে আছে, খুব দ্রুত বইখানি বিক্রি হয়ে যায়, এবং ক্রেতারা বেশির ভাগই কলেজের ছাত্র। বিখ্যাত পত্রিকাদিতে সবিস্তারে ভাল সমালোচনাও করা হয়। এই নতুন সংস্করণের 'সংযোজন' অংশে কয়েকটি সমালোচনা উদ্ধৃত করেছি। উল্লেখ্য হল, যে-পত্রিকাতে কখনও কোনো বাংলা বই-এর উল্লেখ বা আলোচনা করা হয়নি, সেই পত্রিকাতে (The Statesman) এই বইখানির উল্লেখ ও সমালোচনা করা হয়। কেন করা হয় তা কার্ল মার্ক্সই জানেন। আর তখন যারা মার্ক্সবাদী ছিলেন তাঁরা জানেন এবং বর্তমানে যাঁরা মার্ক্সবাদী তাঁরা একটু চিন্তা করলেই জানতে পারবেন। 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকার সমালোচনাতে বেশ ধারালো খোঁচা ছিল। বয়সের জন্য দেহের চামড়া তখনও খুব পুরু হয়নি বলে, খোঁচাটা লেখকের গায়েও বিঁধেছে। তবে যাঁরা বাণটি মেরেছিলেন তাঁরা লেখককে ধরাশায়ী করতে পারেননি এবং তাঁরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন যখন ছ'মাসের মধ্যে লেখকের

দ্বিতীয় মার্ক্‌সীয় সাহিত্য-সমালোচনার বই প্রকাশিত হয় ('নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা'—এই বইটিরও দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে)।

মার্ক্‌সবাদের জ্ঞান অগভীর হলেও আজকের দিনে লেখাগুলি একাধিকবার পড়ে দেখেছি, খুব খারাপ লিখিনি এবং ভুলও মারাত্মক কিছু করিনি। তবে লেখার মধ্যে কিছুটা জড়তা ও অস্পষ্টতা আছে। মূল প্রতিপাদ্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রায় ঠিকই আছে। নির্ভুল এমন কথা বলব না, কোনো মার্ক্‌সবাদীই তা বলতে পারেন না। বর্তমানে মার্কসীয় সাহিত্য-শিল্পের আলোচনা নানাদিকের দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে ও হচ্ছে। সমাজের বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তি (Base) এবং উপরের সাহিত্য-শিল্পকলার সৌধ (Superstructure) নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লুকাচ, রেমণ্ড উইলিয়ামস, মরিস গদেলিয়ের এবং আরও অনেকে। গ্রাম্‌সিও এ বিষয়ে তাঁর জেলখানার নোটবুকে আলোচনা করেছেন (বইয়ের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য)। এইসব আলোচনার ফলে মার্ক্‌সীয় নন্দনতত্ত্ব (Aesthetics) ও সাহিত্যশিল্পালোচনা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। তার পরিচয় দিতে গেলে নতুন করে বড় একটি বই লিখতে হয়।

বিনয় ঘোষ

জুন ১৯৮০

প্রথম অধ্যায়

ডায়লেক্‌টিক্‌স

মার্কসীয় দর্শনকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) বলা হয় কারণ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করবার মার্কসীয় রীতি হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক (Dialectical), এবং সেই সব ঘটনার বিশ্লেষণ-পদ্ধতি হচ্ছে বাস্তবপন্থী (Materialistic)। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক জীবন, সামাজিক ঘটনা ও সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন করাকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)।

এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ দার্শনিক হেগেলের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে এই দর্শনের মূল কাঠামোটি তিনিই গড়েছিলেন। তাই বলে এ মনে করা ভুল যে মার্কস্‌-এঙ্গেলস্‌-এর ডায়লেকৃটিক্‌স এবং হেগেলের ডায়লেকৃটিক্‌স-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ হেগেলীয় ডায়লেকৃটিক্‌স-এর উপরের আদর্শপ্রধান খোলসটিকে বাদ দিয়ে ভিতরের সার পদার্থ টুকু ছেঁকে নিয়ে তাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিবর্ধিত করেছিলেন। মার্কস্‌ বলেছেন

My dialectic method is fundamentally not only different from the Hegelian, but is its direct opposite. To Hegel, the process of thinking, which, under the name of 'the idea', he even transforms into an independent subject, is the demiurge of the real world, and the real world is only the external, phenomenal form of 'the idea'. With me, on the contrary, the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind, and translated into forms of thought.

"আমার ডায়লেকৃটিক্‌ পদ্ধতি ও হেগেলীয় ডায়লেকৃটিক্‌স-এর মধ্যে শুধু যে বিরাট ব্যবধান আছে তা নয়, দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। হেগেল বলেন যে দৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে 'ভাব'-জাত, এই ভাবের স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং বাইরের জগৎ হচ্ছে 'ভাবে'র বহিরাকৃতি। আমি মনে করি ঠিক বিপরীত। আমার মতে 'ভাব' হচ্ছে মানুষের মনে বহির্জগতের প্রতিফলন এবং পরে এই ভাব চিন্তাতে রূপ পরিগ্রহ করে।"

হেগেল বলেন মূল চৈতন্য থেকে অভিব্যক্ত এই জগৎ আমাদের ক্ষুদ্র চৈতন্যের দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে। মনে করুন, আমার হাতে যে ফলটি আছে, তার রং, রূপ, গন্ধ, আকৃতি প্রভৃতি কতকগুলি গুণমাত্র আমার মন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করে বাইরে ফলের অস্তিত্বকে অনুভব করছে। এই কয়েকটি গুণ ভিন্ন আমি ফলের অন্য কিছু গ্রহণ করছি না। আর একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে এদের আমার মন গ্রহণ করছে বলে আমার কাছে এই ফলের অস্তিত্ব আছে। এই ফলের অস্তিত্ব অন্তত আমার কাছে আমার মনের উপর নির্ভর করে। আমার মন না থাকলে এর অস্তিত্ব আমার কাছে থাকত না। সুতরাং এই ফল আমার মন দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু অন্যদিকে এই ফলের একটি বাস্তব অস্তিত্ব বাইরে আছে। আমি ভাবতে পারি যে আমার মন থাকুক বা না থাকুক, ফল থাকে ও থাকবে। সুতরাং এই ফল সম্বন্ধে আমার জ্ঞান = আমার মনোসৃষ্ট ফলের কতকগুলি গুণ + ফল 'বাইরে আছে' এই জ্ঞান। এই রকম সমস্ত বস্তুজগৎ আমার মতো চৈতন্যযুক্ত জীবদের মনোগ্রাহ্য, তবে মনের বাইরে অস্তিত্বযুক্ত ধারণার বিলোপ আমাদের কারও হয় না। এখন আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে মনোসৃষ্ট হয়েও আমার মনের 'বাইরে আছে' এ-ভাব কোথা থেকে আসে? এর একমাত্র মীমাংসা হেগেল এইভাবে করেছেন যে মনোসৃষ্ট সত্য কথা, কিন্তু শুধু আমাদের মনোসৃষ্ট নয়, এক অনন্ত নিরপেক্ষ মনের সৃষ্ট। এইজন্যই মনের সৃষ্ট হলেও আমাদের কাছে মনের 'বাইরে আছে' মনে হয়। এই নিত্য অনন্ত মনোময়ই পরমেশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হেগেলের এই একমাত্র যুক্তিযুক্ত প্রমাণ।

বস্তুর স্বভাব কি? আমরা দেখতে পাই যার ক্রিয়াকারিত্ব নেই তা বস্তুই নয়। আমার সামনের চেয়ারটি একটি বস্তু, কারণ এর ক্রিয়াপ্রকাশ আমার মনে হয়েছে। কোনো ক্রিয়াগুণ নেই এমন বস্তুর ধারণাই আমাদের নেই। বস্তু হলেই ক্রিয়াগুণ থাকবে। কিন্তু জ্ঞানের স্বভাব কি? কোনো জ্ঞান তার বিরুদ্ধ জ্ঞান না হলে সম্ভব হয় না, যেমন এই চেয়ারের জ্ঞান 'চেয়ার না' এই জ্ঞান সঙ্গে না থাকলে সম্ভব নয়। "আমি" এই জ্ঞান "আমি না" এই রকম জ্ঞানের সঙ্গে সম্ভব। সুতরাং জ্ঞান কখনো তার বিপরীত জ্ঞানের জন্ম না দিয়ে জ্ঞানরূপে গণ্য হয় না। তা ছাড়া জ্ঞান ও সত্তা মূলত এক জিনিস। জ্ঞানের শুদ্ধাবস্থা বা জ্ঞান মাত্র ও সত্তার শুদ্ধাবস্থা বা সত্তা মাত্র অভিন্ন। একেই হেগেল বলেন জ্ঞান ও সত্তার একত্ববাদ (Identity of Thinking and Being)।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি যে, (১) সত্তার নিয়ম তার ক্রিয়াকারিত্ব বা পরিবর্তনশীলতা; (২) জ্ঞানের নিয়ম বিরুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত থাকা; (৩) শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধসত্তা অভিন্ন। সুতরাং সত্তা ও জ্ঞান একবস্তু হোলে, সেই একবস্তু সত্তার নিয়মানুসারে অন্য বস্তুতে পরিণত হবে এবং জ্ঞানের নিয়মানুসারে সেই পরিণত বস্তু হবে তার বিরুদ্ধভাব। আবার এই দুয়ে মিলে নূতন সত্তাতে পরিণত হবে। হেগেলের ভাষায় বিশুদ্ধ সত্তা (Pure Being) তার বিরুদ্ধ অ-সত্তাকে (non-Being) বিক্ষিপ্ত করে. পরে দুটিতে মিলে তৃতীয় বস্তু ভাব-এ (Becoming) রূপান্তরিত হয়। তারপর পুনরায় এই নিয়মে পরিণত হয়। এই ক্রমপরিণতিতে দেশ, কাল ও দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশিত হয়। জ্ঞান বিকাশের এই তিন স্তরকে হেগেল যথাক্রমে স্থিতি (Thesis), প্রতি-স্থিতি (anti-Thesis) ও সমন্বিত-স্থিতি (Synthesis) আখ্যা দিয়েছেন। এ শুধু জ্ঞান বিকাশের নিয়ম নয়, জগৎ সৃষ্টিরও নিয়ম। দেশ, কাল এই ক্রমপরিণতির অন্তর্ভুক্ত মাত্র, মূলে নয়। মূল দেশ ও কালের অতীতে। আদি-কারণ চৈতন্য কখনো সৃষ্টি ভিন্ন নয়, কারণ হেগেল বলেন আদি-কারণ অর্থাৎ চৈতন্য ও তার বিক্ষিপ্ত সৃষ্টি, দুটিতে মিলে একটি পূর্ণ সত্তা। আদি-চৈতন্য এই সৃষ্টিতেই সত্তাবান, উপলব্ধ (realised)। এই নিত্য সত্তাবান চৈতন্যই দার্শনিক হেগেলের পরমেশ্বর এবং তাঁর এই যৌক্তিক ভিত্তির উপরেই তাঁর আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত।

হেগেলের এই ঐশ্বরিক কল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দিলেন লাড্‌উইগ ফোয়েরবাখ। "Feuerbach belongs to Hegel as much as the beaker of hemlock to Socrates"—সক্রেটিস্‌-এর কাছে তাঁর বিষের পাত্র যেমন ছিল, হেগেলের কাছে ফোয়েরবাখ ঠিক তেমনি ছিলেন। ফোয়েরবাখ বললেন

It is a question today you say, no longer of the existence or the non-existence of God but of the existence or the non-existence of man ; not whether God is a creature whose nature is the same as ours but whether we human beings are to be equal among ourselves ; not whether and how we can partake of the Lord by eating bread but whether we have enough bread for our own bodies ; . not whether we are christians or heathens, theists or atheists, but whether we are or can become men, healthy in soul and body, free, active, and full of

vitality...I deny God. But that means for me that I deny the negation of man.

"আজকের প্রশ্ন হচ্ছে দেবতা আছে কি নেই তা নয়, মানুষের অস্তিত্ব আছে কি নেই সেই প্রশ্ন ; এ-প্রশ্ন নয় যে দেবতা এমন কোনো জীব কিনা যাঁর স্বভাব আমাদেরই মতো, প্রশ্ন হচ্ছে আমরা আমাদের মধ্যে সমান হব কিনা ; রুটি খেয়ে দেবতার মতো শরীর পাব কেমন করে তা নয়, আমাদের শরীরের জন্য প্রচুর রুটি মিলবে কিনা···আমরা খ্রীস্টান বা পৌত্তলিক, ঈশ্বরবাদী বা নিরীশ্বর-বাদী সে-সব প্রশ্ন নয়, আমরা সত্য মানুষ কিনা বা মানুষ হতে পারি কিনা, সুন্দর, স্বাধীন কর্মঠ, জীবন্ত মানুষ···আমি দেবতাকে অস্বীকার করি কারণ আমি মানুষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করি না।"

এই প্রকার তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় ফোয়েরবাখ হেগেলের ঐশীভাবকে ছিন্নভিন্ন করে মানুষের জয়গান গাইলেন, মানবতাকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁর "Essence of Christianity" নামক পুস্তকের মধ্যে তিনি বললেন সব ধর্মের মধ্যে কিছু সত্য আছে তবে সে-সত্য কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে, এবং ঈশ্বর-দর্শনের (Theology) উদ্দেশ্য সেই কুয়াশাকে, সেই অলৌকিকত্বের আস্তরণকে যুক্তি দিয়ে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করা। ফোয়েরবাখ বললেন

Religion is the dream of the human mind. But even in dreams we do not find ourselves in emptiness or in heaven, but on earth, in the realm of reality ; we only see real things in the entrancing splendour of imagination and caprice, instead of in the simple daylight of reality and necessity.

"ধর্ম মানুষের মনের স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নেও আমরা শূন্যে বা স্বর্গে বিচরণ করি না, এই পৃথিবীতে, বাস্তব রাজ্যেই আমরা থাকি, আমরা সত্য জিনিসকে দেখি কল্পনার জ্যোতিতে সমাধিস্থ হয়ে, বিমুগ্ধ হয়ে, প্রয়োজনের বা বাস্তবের স্বচ্ছ দিবালোকে নয়।" ধর্ম মানুষের ব্যাহত ও ব্যর্থ মনোভাবের প্রকাশ। এ-পৃথিবীতে যখন মানুষ তার ভাব চরিতার্থতা সম্বন্ধে নিরুপায় হয়ে যায় তখন Miracle, Mythology ও Theology-র মধ্যে তার সেই মানসিক অভাবকে সে পূরণ করে।

হেগেল ও ফোয়েরবাখ এই দুজনের দ্বারাই মার্কস্ যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু দুজনের ভুল তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ব্রুণো বয়ার, রুজ্, মাক্স্

স্টার্নার প্রমুখ Young Hegelianরা হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌সকে বিকৃত করে যেখানে যেমনভাবে খুশি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মার্কস্ তা করেননি। মার্কস্ ছিলেন হেগেলের প্রকৃত শিষ্য। ফোয়েরবাখ-এর 'কাল্পনিক মানুষ', তাঁর ইতিহাস-অতীত মানবতা, মার্কস্‌কে আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু সে শুধু মানুষ বলে, আধিদৈবিক স্বর্গ থেকে ফোয়েরবাখ প্রাকৃতিক জগতে নেমে এসেছিলেন বলে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভিন্ন মার্কস্-এর কাছে ডায়লেক্‌টিক্‌স-এর কোনো অর্থ নেই। মার্কস্ বলেন যে শ্রেণী-সচেতন হয়ে সমাজ আত্ম-সচেতন হয়। সচেতনতার অর্থ ক্রিয়াশীলতা এবং এই শ্রেণী-সচেতনতার ক্রিয়াশীলতার জন্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-জড়িত সমগ্র সমাজ নূতন নূতন রূপ ধারণ করে। এই ঐতিহাসিক প্রণালীর (Process) কর্তা (Subject) হচ্ছে শ্রেণী, সমাজের এই রূপান্তর এই শ্রেণীর উপর নির্ভর করে, এবং সামাজিক প্রতিবেশ হচ্ছে কর্ম, যাকে রূপান্তরিত করা হয়। মার্কস্ বলেন যে মানুষ এই সামাজিক পরিবেষ্টনকে পরিবর্তন করে এবং নিজেও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়—"By acting on the external world and changing it, man changes his own nature." ইতিহাসে মানুষ সেইজন্য ধ্রুবক (constant) নয়, মানুষ পরিবর্তনশীল—"All history is the progressive modification of human nature" —সমাজের উৎপাদন-শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের ক্রমিক পরিবর্তন হয় এবং তার ফলে হয় সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই সামাজিক রূপান্তর একমাত্র বিপ্লবেই সম্ভব কারণ শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে বিপ্লব ভিন্ন সমাজের রূপান্তর সম্ভব নয়। এই হচ্ছে মার্কস্-এর মূলকথা।

হেগেলীয় ডায়লেক্‌টিক্‌স-এর সারমর্মটুকু মার্কস্ বুঝেছিলেন। প্রুধোঁ (Proudhon) "The System of Economic Contradictions" নামক পুস্তক লিখে তার দ্বিতীয় নাম দিলেন "The philosophy of poverty", এবং মার্কস্ প্রুধোঁকে জবাব দিলেন "The poverty of philosophy"র মধ্যে। এই উত্তরের মধ্যে মার্কস্ তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। বইখানি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মার্কস্ রিকার্ডো (Ricardo) থেকে 'সোশ্যালিস্ট' হয়েছেন এবং দ্বিতীয় ভাগে হেগেল থেকে 'ইকনমিস্ট' হয়েছেন। রিকার্ডো প্রমাণ করেছেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজে দ্রব্যের আদানপ্রদান নির্ভর করে দ্রব্য উৎপাদনের শ্রম-সময়ের উপর। প্রুধোঁ বলেন যে দ্রব্যের এমনভাবে বিনিময় হওয়া উচিত যাতে উভয়েরই শ্রমের সময় ঠিক থাকে, অর্থাৎ

এক দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় অন্য দ্রব্যের হবে যদি উভয়েরই উৎপাদন-সময়ের তারতম্য না হয়। সমাজের এমনভাবে সংস্কার প্রয়োজন যাতে সকলেই শ্রমিক হয় এবং সকলেই সমশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় করতে পারে। মার্কস্ প্রুধোঁর এই পেটী-বুর্জোয়া কল্পনাকে তীব্র সমালোচনা করে বললেন যে শ্রেণীবিরোধ ভিন্ন ব্যক্তিগত বিনিময় আজগুবি স্বপ্ন মাত্র। মার্কস্ বললেন

With the beginning of civilisation production begins to build itself up on the anti-thesis of occupation, social position of class, and finally on the anti-thesis of accumulated and direct labour. Without anti-thesis there can be no progress : civilisation has acknowledged this law down to the present day. Up to the present the productive forces have been developed on the basis of this dominance of class contradiction.

"সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে শ্রেণীর সামাজিক অবস্থা ও প্রতি-স্থিতির উপর উৎপাদন গড়ে উঠেছে এবং শেষে বর্ধিত হয়েছে সঞ্চিত ও প্রত্যক্ষ শ্রমের প্রতি-স্থিতির উপর। প্রতি-স্থিতি ভিন্ন প্রগতি সম্ভব নয় এবং সভ্যতা এই নিয়মে বর্তমান পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। উৎপাদন শক্তিগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রেণী-বিরোধের আধিপত্যের উপর।"

মার্কস্ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে ১৭৭০ সালে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকেরা যা উৎপাদন করত ১৮৪০ সালে তার চাইতে সাতাশ গুণ বেশি করেছে এবং এই উৎপাদন-শক্তি শ্রেণী-বিরোধের বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার জন্য সম্ভব হয়েছে।

মার্কস্ এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে হেগেল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রুধোঁ ভুল বুঝেছেন হেগেলকে। হেগেলীয় দর্শনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশটি অর্থাৎ বস্তুজগৎ যে ভাবজগৎ থেকে উদ্ভূত এই দিকটিকে প্রুধোঁ আঁকড়ে ধরেছিলেন, তার বৈপ্লবিক মর্ম তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। এই বৈপ্লবিক মর্মটুকু হচ্ছে ভাবের স্বতঃক্রিয়াশীলতা, যা স্থিতি ও প্রতি-স্থিতির সৃষ্টি করে এ-দুয়ের পারস্পরিক বিরোধকে বিলোপ করে উচ্চতর সমন্বিত স্থিতিতে উন্নীত হয়। হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌সকে প্রুধোঁ দু'ভাগে ভাগ করেছেন, 'ভাল' ও 'মন্দ' দিক, এবং বলেছেন যে মন্দ দিক ধ্বংস করে ভালকে প্রতিষ্ঠিত করা সত্যকার 'সোশ্যালিস্টে'র কর্তব্য। হেগেলের উপযুক্ত ছাত্র হিসাবে মার্কস্ প্রুধোঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে প্রুধোঁ ব্যাকুল হয়ে যে 'মন্দ' দিকটিকে

বিনাশ করতে চান, সেই দিকটির জন্যই সংগ্রামের ভিতর দিয়ে ঐতিহাসিক সম্ভব হয়েছে। যদি কেউ সামন্ততন্ত্রের শুধু ভাল দিকগুলিকে অর্থাৎ শহরের প্যাট্রিয়ার্কাল্‌ জীবন, গৃহশিল্পের উন্নতি, নগরশিল্পের ক্রমবিকাশ প্রভৃতিকে রক্ষা করে অন্য মন্দ দিকগুলিকে, যথা দাসত্ব, সুবিধাবাদ, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতিকে নষ্ট করতে চেষ্টা করতেন, তা হলে সংগ্রামের প্রকৃত শক্তিগুলিকে ধ্বংস করা হত এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থানকে ভ্রূণহত্যা করা হত। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসে তা কোনোদিন ঘটেনি, ঘটা সম্ভবও না।

মার্কস্‌-এর ভাষায় এর সমাধান এই ভাবে হওয়া উচিত

If one wishes to estimate feudal production correctly one must regard it as a mode of production based on contradiction. One must show how riches were produced within this contradiction, how the productive forces developed simultaneously with the struggle of the classes, and how one of these classes, the bad side, the social evil, grew ceaselessly until the material conditions for its emancipation had ripened.

"সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনের সঠিক বিচার করতে হলে এই উৎপাদন-প্রণালীকে বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বীকার করতে হবে। দেখতে হবে কেমনভাবে এই বিরোধের মধ্যেই ধনোৎপাদন সম্ভব হচ্ছে, কেমনভাবে শ্রেণীসংগ্রামের ভিতরেই উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ক্রমে কি উপায়ে এই দুই শ্রেণীর এক শ্রেণী, অর্থাৎ সামাজিক দোষত্রুটি, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি খারাপ দিকগুলি, ক্রমে শক্তিশালী হয়ে এমন বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করছে যাতে তার মুক্তি সম্ভব হচ্ছে।" বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশও মার্কস্‌ এইভাবে বিচার করেছেন। সেইজন্যই জর্জ স্যাণ্ড থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করে মার্কস প্রুধোঁর এই উত্তর শেষ করেছেন: "Victory or death! Bloody war or nothing! This is the pitiless formulation of the question." "হয় জয়, না হয় মৃত্যু! রুধির-প্লাবিত সংগ্রাম, না হয় একেবারেই কিছু না! এইরকম নির্মমভাবেই এই সমস্যার মীমাংসা সম্ভব।"

প্রুধোঁকে লিখিত এই উত্তরের মধ্যেই মার্কস্‌ জার্মান দর্শনের সঙ্গে তাঁর হিসাবনিকাশ চুকিয়ে দিলেন। মার্কস্‌ হেগেলীয় দর্শনে ফিরে এসে ফোয়েরবাখকে ছাড়িয়ে গেলেন। হেগেলীয় স্কুলের অন্তঃসারশূন্যতা ও অবনতির

বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ করে মার্কস্‌ হেগেলীয় ডায়লেক্‌টিক্‌স-এর সারটুকু নিঙড়ে নিয়ে সকলের কাছে প্রকাশ করলেন। মার্কস্‌ বুঝেছিলেন যে হেগেলীয়ান্‌রা আর যাই হোন হেগেল নন। হেগেলীয় দর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল, যার জন্য হেগেল বিশাল প্রচ্ছদপটে ইতিহাসকে দেখেছিলেন, যদিও অবশ্য তিনি ছিলেন আদর্শবাদী এবং সমস্ত বিষয়কে ও ইতিহাসকে তিনি অবতল আয়নার (concave mirror) ভিতর দিয়ে দেখেছিলেন, যেজন্য পৃথিবীর ইতিহাস তাঁর কাছে ভাববিকাশের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। গোঁড়া হেগেলীয়ান্‌রা হেগেলীয় দর্শনের এই মর্মটুকু পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ফোয়েরবাখও তার ন্যায্য মূল্য দেননি। মার্কস্‌ ভাবরাজ্য থেকে নিজেকে নির্বাসিত করে নির্মম বাস্তব জগৎ থেকে ইতিহাসের বিচার করে বস্তুবাদের ঐতিহাসিক ডায়লেক্‌টিক্যাল পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, এবং ফোয়েরবাখ-এর মধ্যে যে "energising principle"-এর অভাব ছিল তাকে পূরণ করে শুধু সমাজের বিশ্লেষণ করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে রূপান্তরিত করবার পথটিরও নির্দেশ দিলেন।

কার্ল মার্কস্‌ ও ফোয়েরবাখ-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হলে ফোয়েরবাখ সম্বন্ধে মার্কস্‌-এর এগারোটি থিসিস্‌ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেকটি থিসিস্‌ নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করব না, বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটিকে বিশ্লেষণ করব।*

Thesis I—The chief defect of all previous materialism—including Feuerbach's—is that the object, reality, sensibility, is conceived only in the form of the object or as conception, but not as human sensory activity, practice (*Praxis*), not subjectively. That is why it happened that the *active* side (of the object), in opposition to materialism, was developed by idealism—but only abstractly, for idealism, naturally, does not know real, sensory activity as such. Feuerbach wants to recognise sensory objects which are really differentiated from objects of thought, but he does not conceive human activity itself as an objective activity. Consequently

* যাঁরা এ-সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চান তাঁরা F. Engels-এর "Feuerbach" এবং Sydney Hook-এর "From Hegel to Marx"—(Chapter VIII) পড়তে পারেন।

in the *Essence of Christianity*, he regards only the theoretical attitude as the truly human one, while parctice is conceived and fixed only in its dirty-Jewish form. Hence he does not grasp the significance of 'revolutionary', of practical, critical, activity.

প্রথম থিসিস্‌: "পূর্বেকার সমস্ত বস্তুবাদের, এমনকি ফোয়েরবাখ-এরও, প্রধান ত্রুটি হচ্ছে যে বিষয়, বাস্তব, সংবেদন,—এর প্রত্যেকটিকে প্রত্যয়ী হিসাবে ভাবা হয়, এবং মানুষের সংজ্ঞাক্রিয়া ও ব্যবহার হিসাবে বা এক কথায় বিষয়ী-ভূত ভাবে বিচার করা হয় না। সেইজন্য বস্তুবাদ-বিরোধী উপায়ে বিষয়ের সক্রিয় দিকটি আদর্শবাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছিল, কিন্তু তাও বিমূর্তভাবে, কারণ বস্তু বা সংজ্ঞাক্রিয়া কি তা আদর্শবাদের অজ্ঞাত। চিন্তার বিষয় থেকে বিভিন্ন সংজ্ঞাক্রিয়াকে ফোয়েরবাখ স্বীকার করতে চান কিন্তু তিনি মানুষিক ক্রিয়াকে বিষয়-ভূত ক্রিয়ার মধ্যে গণনা করেন না। ফলে তাঁর "এসেন্স অফ্‌ ক্রিশ্চানিটি"র মধ্যে তিনি অধীত মনোভাবকে মানুষিক বলেছেন, এবং ফলিত মনোভাবকে উপেক্ষা করেছেন। ফোয়েরবাখ সেইজন্য বৈপ্লবিক ও ফলিত ক্রিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি।"

প্রথম থিসিস্‌-এর মধ্যে মার্কস্‌-এর দুটি মন্তব্য লক্ষণীয়। প্রথম হচ্ছে ডেমক্রিটাস্‌ থেকে ফোয়েরবাখ পর্যন্ত সমস্ত বস্তুবাদের সমালোচনা; দ্বিতীয় হচ্ছে ফোয়েরবাখীয় সমাধানের সমালোচনা। প্রথমটির প্রশ্ন হচ্ছে মানুষ জ্ঞানলাভের জন্য কতদূর সক্রিয় থাকে; দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যবহারের (Praxis) মার্কসীয় ব্যাখ্যা। মার্কস্‌ বললেন যে ইতিহাসের জ্ঞানের জন্য মানুষ থেকে আরম্ভ করবার অর্থ হচ্ছে মানুষের চাহিদা (needs) থেকে অনুসন্ধান শুরু করা। ফোয়েরবাখ-এর বিমূর্ত চাহিদা নয়, মানুষের প্রাথমিক উৎপাদন, প্রজনন ও জ্ঞাপনের চাহিদা। এই চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য যন্ত্রাদির উদ্ভাবন আবশ্যক এবং এর ফলে সমাজে শ্রমবিভাগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পুরাতন চাহিদা (old needs) মেটানোর প্রচেষ্টার মধ্যেই নূতন চাহিদার সৃষ্টি হয়। ইতিহাসের গতি কোনো নিরপেক্ষ মনের উপর নির্ভরশীল নয়, মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক চাহিদা-তৃপ্তির প্রচেষ্টা ও ক্রিয়া হচ্ছে ইতিহাসের প্রাণ। মানুষের চাহিদার প্রকৃতি ও গুণ এবং সেই চাহিদা-তৃপ্তির উপায়ের বা পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য শুধু যে ইতিহাসের পরিবর্তন হয় তা নয়, মানুষের স্বভাবেরও রূপাবর্তন হয়। মার্কস্‌-এর

মতে প্রকৃতি (nature) ও ইতিহাসের মধ্যে হেতু (middle term) হচ্ছে মানুষের মূর্ত চাহিদা (concrete needs)। চাহিদা ও তার সন্তুষ্টির সম্ভাব্যতার (possibility) কারণ হচ্ছে মানুষের পরিবেষ্টন ও শরীরের জৈব গঠন। মনের ও ইন্দ্রিয়ের এই চাহিদা কোনো বিশেষ উপায়ে পরিতৃপ্ত হয় এবং চাহিদা বৃদ্ধিও হয় সঙ্গে সঙ্গে। এ দুয়েরই কারণ হচ্ছে বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা। শারীরিক অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার অন্তঃক্রিয়ার প্রতিফল হচ্ছে ইতিহাস। দর্শনও কোনো সামাজিক চাহিদা পরিতৃপ্তির জন্য ঐতিহাসিক ক্রিয়া। যেহেতু মানুষ পরিবেষ্টন-সাপেক্ষ, পরিবেষ্টনকে সে রক্ষা করতে পারে, কারণ মানুষের ক্রিয়া হচ্ছে (যার মধ্যে চিন্তাও একটি) বিষয়-ভূত ক্রিয়া, যার বিষয়-ভূত ফলাফল আছে।

মার্কসীয় প্র্যাক্সিস্ (Praxis) কি? মানুষ, বিষয়, সমাজ, চাহিদা ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে ফোয়েরবাখ-এর ইতিহাস-বর্জিত (unhistorical), বিমূর্ত ধারণা থাকার জন্য তিনি আদর্শবাদের স্বখাত সলিলে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের কি হওয়া উচিত, মানুষ সকল অবস্থায় ও সময়ে কি হতে পারত অর্থাৎ 'আসল মানুষে'র আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফোয়েরবাখ-এর আদর্শের সঙ্গে যেহেতু মানুষের কোনো মূর্ত চাহিদা ও সমাজের কোনো মূর্ত ব্যবস্থার সংযোগ নেই, সেইজন্য সে আদর্শ সমাজের পরিবর্তক হিসাবে শক্তিহীন। তাঁর আদর্শকে কোনো বৈপ্লবিক ব্যবহারে রূপ দিতে না পেরে, ফোয়েরবাখ তাকে রূপ দিলেন ধর্মে। মার্কস ফোয়েরবাখ-এর অধ্যয়ন (theory) ও ব্যবহার (praxis),—উভয় ধারণারই বিরোধী ছিলেন। অধ্যয়ন হচ্ছে কর্ম-নিয়ন্তা; ব্যবহার হচ্ছে সেই সব বিশেষ ক্রিয়া (specific activities) যার দ্বারা অধ্যয়নকে যাচাই করা হবে।

Thesis III—The materialistic doctrine that men are the products of circumstances and education, and that changed men are therefore the products of other circumstances and a changed education, forgets that circumstances are changed by men, and that the educator must himself be educated. Consequently materialism necessarily leads to a division of Society into two parts, of which one is elevated above Society (e.g. in Robert Owen).

The coincidence of the transformation of circumstances and of human activity can only be conceived and rationally understood as revolutionising practice (*Praxis*).

তৃতীয় থিসিস্‌ঃ "যে বস্তুবাদী নীতি প্রতিপন্ন করে যে মানুষ শিক্ষা ও পরিবেষ্টন সঞ্জাত এবং পরিবর্তিত মানুষ অন্য পরিবেষ্টন ও শিক্ষার সৃষ্টি, তার প্রধান গলদ হচ্ছে এই যে মানুষের দ্বারাও যে পরিবেষ্টন পরিবর্তিত হয় এবং শিক্ষকের যে নিজেরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে এই দুটি বিষয়কেই প্রত্যাখ্যান করে। ফলে সে-বস্তুবাদ সমাজকে দুভাগে ভাগ করে এবং এক ভাগ সমাজের উপরে উন্নীত হয় (যেমন রবার্ট ওয়েন্‌-এর)।

পরিবেষ্টন ও মানুষিক ক্রিয়ার রূপান্তরের মিলন একমাত্র বৈপ্লবিক ব্যবহার হিসাবেই বোধগম্য।"

মার্কস্‌ এখানে কল্পনাপ্রবণ সমাজতান্ত্রিকদের প্রশ্ন তুলেছেন কারণ ফোয়েরবাখকে তিনি এই স্কুলেরই দার্শনিক মনে করেন। মার্কস্‌ ফোয়েরবাখ সম্বন্ধে বলেন যে "in so far as he is a materialist, history does not exist for him, and in so far as he treats of history he is no materialist"—ফোয়েরবাখ যখন বস্তুবাদী তখন তাঁর কাছে ইতিহাসের অস্তিত্ব নেই এবং তিনি যখন ঐতিহাসিক তখন তিনি বস্তুবাদী নন। এই ভাবপ্রবণ সমাজতান্ত্রিকদের (Utopian Socialists) সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্কস্‌ যে বিদ্রূপ ও শ্লেষ করেছেন তা সত্যই উপভোগ্য। এই ভাবুকবৃন্দ মনে করেন যে অন্য সকলের শিক্ষা ও দর্শন পরিবেষ্টন-জাত, শুধু তাঁরাই 'ব্যতিরেকের' মধ্যে গণ্য। সেইজন্য এঁদের বস্তুবাদ প্রয়োগ করলে সমাজ দ্বিখণ্ডিত হয়—এক শ্রেণীর অর্থাৎ সাধারণ শ্রেণীর ভাব পরিবেষ্টন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আর এক শ্রেণী অর্থাৎ এই ভাবুক গোষ্ঠীর ভাব তাঁদের মর্জির উপর নির্ভর করে। এঁরা ভাবেন যে এঁদের আদর্শের সমর্থনলাভের জন্য কপর্দকশূন্য ভিক্ষুক থেকে মহারাজাধিরাজের কাছে পর্যন্ত অপ্রতিহত আবেদন করা চলতে পারে, কারণ সমাজের মঙ্গল ও উন্নতি নির্ভর করে এই মুষ্টিমেয় দেবতার বরপুত্রদের উপর। সুচিন্তার উপর এঁদের চিরস্থায়ী মালিকানা। মার্কস্‌ যে এ-সব বিশ্বাস করেন না তা আমি পূর্বেই বলেছি। মার্কস্‌ বলেন মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ, এদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের স্বভাবের ও সমাজ-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে।

Thesis XI—Philosophers have only *interpreted* the world differently : the point is, however, to *change* it.

একাদশ থিসিস —দার্শনিকেরা বিভিন্নভাবে এ-পৃথিবীর ব্যাখ্যা করেছেন—কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে তাকে পরিবর্তন করা।

মানবতা ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে ফোয়েরবাখ ভাবপ্রবণ ভাষা ব্যবহার করলেও মার্কস্ তাঁর তীব্র সমালোচনা করতে পশ্চাৎপদ হননি। স্বাস্থ্যবান, ধনী একশ্রেণী মানুষের সঙ্গে বুভুক্ষু, রুগ্ন, ক্লিষ্ট আর একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে মূর্ত পার্থক্য আছে তাকে ফোয়েরবাখ বিশেষ গ্রাহ্য করেন না। তাদের মধ্যে যে মনুষ্য-জীবগত সাধারণ বিশেষত্ব আছে তাই হচ্ছে ফোয়েরবাখ-এর কাছে বেশি মূল্যবান। ফোয়েরবাখ নিজেকে সাম্যবাদী বলে ঘোষণা করতেন সত্য, এবং এমন জোর গলায় বলতেন যে পুলিসে তাঁর বাসস্থান পর্যন্ত খানাতল্লাস করেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে সাম্যবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণ ছিল ভাষাগত (Philological), রাজনৈতিক নয়। মার্ক্স স্টার্ণার লিখিত ফোয়েরবাখ-এর মানবধর্ম সম্বন্ধে একখানি প্রশংসামুখর পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে ফোয়েরবাখ নিজেই নিজের সম্বন্ধে লিখেছিলেন

Feuerbach is not a materialist, idealist or a believer in the philosophy of identity. Well, then, what is he ? He is in thought as in deed, in spirit as in flesh, in essence as in feeling —*man* ; or rather, since for him the essence of man is given only in society, communal man, communist.

"ফোয়েরবাখ বস্তুবাদী নন, একত্ব-বাদেও বিশ্বাসী নন। তবে ফোয়েরবাখ কি ? কর্মে, চিন্তায়, দেহে, মনে, ভাবে, ফোয়েরবাখ মানুষ ; এবং প্রকৃত মানুষ হচ্ছে সামাজিক মানুষ, কম্যুনাল্ মানুষ, সাম্যবাদী।"

মার্কস্ এই উক্তিকে নির্দেশ করে ফোয়েরবাখ-এর চিন্তার জটিলতা ও অসারত্ব প্রমাণ করলেন। ফোয়েরবাখ-এর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হল যে-বস্তুর অস্তিত্ব আছে তাকে চেতনার রাজ্যে আনা, কিন্তু মার্কস্ বললেন "the real communist aims at the revolutionising of the existing order." ফোয়েরবাথ্-এর 'সাম্যবাদ' ও 'বস্তুবাদে'র সঙ্গে মার্কসীয় সাম্যবাদ ও বস্তুবাদের এই হল ব্যবধান।

মার্কসীয় ডায়লেক্‌টিক্‌স আদর্শবাদীর মনোরাজ্যের আদি-কারণত্বকে ভুল

প্রতিপন্ন করে দৃশ্যমান্ বাস্তব জগৎকে চেতনা ও ভাবের উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল। এ-জগৎ আদি-কারণ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব নয়, অধ্যাস নয়। কোনো বাস্তব ঘটনা বা প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি অজ্ঞেয় নয়, বলতে পারা যায় এখনো অজ্ঞাত, কিন্তু জ্ঞেয় সবকিছুই। মার্কসীয় ডায়লেক্‌টিক্‌স-এর আঘাতে তাই অমর্ত্যলোকের সর্বশক্তিমান ভাগ্যনিয়ন্তা লীলাময় পরমেশ্বরের জ্যোতিঃস্নাত মুকুট মর্ত্যলোকে মাটির উপর খসে পড়ল। সে-মুকুটের অধিকারী হল মানুষ। মানুষের কণ্ঠ থেকে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হল যে এ-পৃথিবীর কিছুই তার কাছে অলৌকিক বা অতিপার্থিব নয়, সবই ব্যাখ্যানযোগ্য ও জ্ঞেয়। সমাজ, সমাজের আদর্শ, মানুষের চিন্তা, ক্রিয়া, প্রকৃতির ভ্রূকুটি—সকলেরই বাস্তবের বীক্ষণাগারে প্রবেশাধিকার আছে। বাস্তবের বীক্ষণাগারের পরীক্ষায় দেখা যায় যে সামাজিক বাস্তব পরিবেষ্টনই হচ্ছে মানুষের ক্রিয়া, চিন্তা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সব কিছুর প্রধান উৎস।

এখন প্রশ্ন হল সমাজের এই বাস্তব পরিবেষ্টন কি? মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী এ-প্রশ্নের উত্তর হল এই যে মানুষের প্রাণধারণের জন্য জীবিকা অর্জনের উপায় ও উপজীব্য উৎপাদন-প্রণালীই সমাজের বাস্তব রূপ। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, যার সাহায্যে বস্তুকে জীবিকাযোগ্য করা হয়, এবং শ্রমিকের শ্রম-দক্ষতা ও উৎপাদন-অভিজ্ঞতা হল সমাজের উৎপাদন-শক্তি। কিন্তু উৎপাদনের শুধু একটি দিক হল এই উৎপাদন-শক্তি (Productive forces), এ-ছাড়া আরও একটি দিক আছে। সেই দিকটি হচ্ছে মানুষের উৎপাদন-কালীন পারস্পরিক সম্বন্ধ (Productive relations)। প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষ একক অবস্থায় সংগ্রাম করে না, দলবদ্ধ হয়ে বা সমাজবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে। সুতরাং উৎপাদনের সময় এবং বিশেষ অবস্থায় মানুষের কোনো বিশেষ সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। সে-সম্বন্ধ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের সম্বন্ধ হতে পারে, প্রভুত্ব ও শোষণের সম্বন্ধও হতে পারে। সুতরাং উৎপাদন বা উৎপাদন-পদ্ধতি (mode of production) বলতে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্বন্ধ দুই-ই বোঝায়।

উৎপাদনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে উৎপাদন-শক্তি দীর্ঘস্থায়ী নয়, সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও বিবর্ধমান। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক ভাব, রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি রূপান্তরিত হয়। উৎপাদনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে প্রথমে

উৎপাদন-যন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদনের পরিবর্তন আরম্ভ হয়। প্রথমে এইভাবে উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বৃদ্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার উপর নির্ভর করে ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন-সম্বন্ধও পরিবর্তিত হয়। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে উৎপাদন-সম্বন্ধের উপর উৎপাদন-শক্তি নির্ভরশীল নয় এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর প্রভাব বিস্তার করে না। উৎপাদন-সম্বন্ধ যেমন উৎপাদন শক্তির উপর নির্ভরশীল, তেমনি আবার উৎপাদন-সম্বন্ধের প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপাদন-শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে উৎপাদন সম্বন্ধ কখনো উৎপাদন-শক্তির খুব পিছনে পড়ে থাকে না, কারণ তাতে বিবর্ধমান উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে তার বিরোধ বাড়ে। পশ্চাৎগামী উৎপাদন-সম্বন্ধের সঙ্গে অগ্রগামী উৎপাদন-শক্তির বিরোধ বিপ্লবের আঘাতে বিলীন হয়ে যায় এবং এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

সমাজের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করলেই এর দৃষ্টান্ত মিলবে। আজ পর্যন্ত সমাজের পাঁচটি রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে—আদিম সাধারণ সমাজ (Primitive Communal Society), দাস সমাজ (Slave Society), সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (Feudal Society), ধনতান্ত্রিক সমাজ (Capitalist Society) ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ (Socialist Society)। আদিম সাধারণ সমাজে উৎপাদন-সম্বন্ধের ভিত্তি ছিল উৎপাদন-পদ্ধতির সামাজিক স্বত্বের উপর। এই সম্বন্ধের তাৎকালিক উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল। পাথরের অস্ত্র, তীরধনুক প্রভৃতি ছিল উৎপাদন-শক্তি এবং সেইজন্য মানুষের পক্ষে একা একা অরণ্যে ঘুরে বন্যজন্তু শিকার করা, বাসগৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হত না, একসঙ্গে কাজ করতে তারা বাধ্য হত। একত্রে শ্রম করবার জন্য শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের উপর সকলের সমানাধিকার ছিল। উৎপাদন-শক্তির বা উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যক্তিগত মালিকানা তখনো ছিল না। আদিম সাধারণ সমাজ ছিল শ্রেণী-শূন্য ও শোষণ-বর্জিত। দাস সমাজে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। দাসপ্রভুরা ছিলেন উৎপাদন-শক্তির মালিক, কারণ খুশিমতো তাঁরা দাস কেনাবেচা করতে পারতেন। এই উৎপাদন-সম্বন্ধের তৎকালের উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি ছিল। মানুষ প্রস্তর-অস্ত্র ছেড়ে ধাতুনির্মিত অস্ত্র আয়ত্তে আনল, শিকার ছেড়ে কৃষি ও গৃহ শিল্পে মন দিল। এই শ্রমবিভাগের ফলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্রব্য-বিনিময় এবং একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর দ্বারা সঞ্চয় সম্ভব হল। ফলে এই সংখ্যালঘু প্রভুগোষ্ঠীর সুবিধা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ দাসদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার এবং স্বেচ্ছাচারিতা

সীমা অতিক্রম করল। ক্রীতদাসের জীবন মনিবের করুণার মুখাপেক্ষী হল। ক্রীতদাস-সমাজের রূপ হল ধনী নির্ধন, শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু হলেন উৎপাদন-শক্তির মালিক, তবে শ্রমিকের পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁর উপর রইল না, শ্রমিক বেচাকেনা তিনি করতে পারেন, হত্যা করতে পারেন না। পাশাপাশি কৃষক ও গৃহশিল্পীদের কিছু-কিছু মালিকানা রইল উৎপাদনযন্ত্রের উপর। এই উৎপাদন-সম্বন্ধেরও তৎকালের উৎপাদনশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। কৃষির ও কর্ষণ অস্ত্রের উন্নতি হয়েছে, পশুপালন, উদ্যানরক্ষা প্রভৃতি আরম্ভ হয়েছে, যন্ত্রশিল্পও সামান্যরূপে দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় শ্রমিকের দিক থেকে শ্রমের প্রতি অনুরাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং সামন্তপ্রভুরা ক্রীতদাসপ্রথা তুলে দিয়ে শ্রমিকদের একটু স্বাধীনতা দিলেন। সামন্তযুগে ব্যক্তিগত মালিকানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শোষণ ও অত্যাচার ভীষণতর আকার ধারণ করল, শ্রেণীসংগ্রামও তীব্রতর হল। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন-সম্বন্ধের ভিত্তি ধনিকগোষ্ঠীর উৎপাদনশক্তির মালিকানা এবং শ্রমিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল। শ্রমিকেরা উৎপাদনশক্তির স্বত্ব থেকে বঞ্চিত এবং জীবনধারণের জন্য ধনিকগোষ্ঠীর কাছে তাদের শ্রম বিক্রয় করতে হয়। নূতন উৎপাদনশক্তির তাগিদে শ্রমিকদের সামান্য কিছু শিক্ষা দিতে হয়, কারণ যন্ত্র পরিচালনার জন্য বুদ্ধির ও শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু এই উৎপাদন-শক্তি এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে ধনতন্ত্র আভ্যন্তরীণ বিরোধের জালে জড়িয়ে গিয়েছে। বৃহৎ পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করে ধনতন্ত্র প্রতিযোগিতাকে তীব্রতর করেছে, ক্ষুদ্র মালিকদের ধ্বংস করে, ক্রয়শক্তি কমিয়ে দিয়ে শ্রমজীবীর স্তরে এনেছে। ফলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শোষণের ফলেও এ-বিরোধ দূর হচ্ছে না। উৎপাদনশক্তি যখন বহুদূর অগ্রসর হয়েছে উৎপাদন-সম্বন্ধ তখন এত পিছিয়ে থাকতে পারে না এবং এ-বিরোধের অবসান একমাত্র বিপ্লবেই সম্ভব। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি আজ এই বিপ্লবের প্রতীক্ষা করছে, কারণ বিপ্লবই হচ্ছে নূতন-সমাজের গর্ভধারিণী প্রাক্তন সমাজের ধাত্রী। এই বিপ্লবের ফলে আজ সোভিয়েট্ য়ুনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে আজ শোষণ নেই, অত্যাচার নেই, সমাজ কর্তৃক উৎপাদন-শক্তি অধিকারের ফলে উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্বন্ধের সামঞ্জস্য স্থাপিত

হয়েছে। সোভিয়েট্ য়্যুনিয়নের এই নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজই আজ পৃথিবীর আদর্শ সমাজ।

সংক্ষেপে এই হল মার্কসীয় ডায়লেকটিক্স এবং এইভাবে এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক জীবন ও সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন করাকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্পের স্বরূপ বিশ্লেষণ

শিল্পী প্রকাশ করেন তাঁর অনুভূতি ও চেতনাকে। ছন্দে বা ভাষার সাহায্যে যা প্রকাশিত হয় তাকে আমরা বলি সাহিত্য ; বর্ণের সাহায্যে যা রূপায়িত হয় তাকে বলি চিত্র ; পাথরে যা মূর্ত হয়ে ওঠে তাকে বলি ভাস্কর্য। শিল্পীর বৃহত্তম উপাদান হল জীবন। জীবনকে তিনি যেকেন্দ্র থেকে উপলব্ধি করবেন তাকেই তিনি প্রকাশ করবেন বাইরে। শিল্পের এই কেন্দ্র সম্পর্কে, অর্থাৎ শিল্প-দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের বিভিন্ন মত আছে। প্রতিনিধি হিসাবে আমরা কয়েকজনকে বেছে নিতে পারি, যেমন হেগেল, বেনেডেটো ক্রোচে ও কার্ল মার্কস্।

হেগেল। হেগেল বলেন দর্শন (philosophy) ও ধর্মের (religion) মতো শিল্পও পরমব্রহ্মের (absolute) উপলব্ধি-প্রয়াসী। কিন্তু এই প্রয়াসের আশ্রয় (medium) প্রত্যেকটির বিভিন্ন। শিল্পের আশ্রয় হচ্ছে কাল্পনিক শক্তি (imaginative power) অথবা প্রতিফলন শক্তি ; ধর্মের আশ্রয় হচ্ছে অনুভূতি (feeling) বা অন্তর্বেগ (emotion) শক্তি ; দর্শনের আশ্রয় হচ্ছে পরমব্রহ্মের বোধশক্তি (cognition)। প্রত্যেক সৃষ্ট শিল্পকে তিনটি উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায় : যে-ভাব (Idea) উপলব্ধি করবার চেষ্টা হয় তাকে বলে শিল্পের আত্মা , প্রতিফলন (representation) বা প্রতীককে (symbol) বলা হয় শিল্পের অঙ্গ ; আর প্রতীকের দ্বারা ভাবের প্রতিভাসন (reflection)। এই প্রতিভাত রূপ হচ্ছে সত্য, সমঞ্জস ও অভিব্যক্ত রূপ। যেখানে এই প্রতিভাসন অস্পষ্ট ও আবছা, যেখানে অসংলগ্ন প্রতিরূপ-সমষ্টিকে (images) সুনিয়ন্ত্রণের মতো ভাবের তেমন বহুলতা নেই, সেই শিল্পকে হেগেল বলেছেন আদিম শিল্প (Oriental Art)। শিল্পের এই আদিম যুগে হেগেল বলেন বস্তুর একটি মিথ্যা অমেয় (infinite) রূপ ছিল এবং এই অমেয়তার কারণ হচ্ছে তৎকালের অপ্রশস্ত সমাজ। শিল্পের উচ্চতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর এই প্রাধান্য ও বৈসাদৃশ্য অন্তর্ধান করে এবং ভাবের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। সাম্য ও সামঞ্জস্যের এই যে সুষমা, প্রত্যয় (conception) ও প্রতীকের

এই যে সঙ্গতি, গ্রীক ভাস্কর্য, গ্রীক নাটক প্রভৃতি ক্ল্যাসিকাল শিল্পের (Classical Art) বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইগুলি। এই ক্ল্যাসিসিজম্-এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে রোমাণ্টিসিজম্ (Romanticism)। ক্ল্যাসিসিজম্-এর রূপ ও বস্তু, আত্মা ও প্রতীকের পারস্পরিক সংযোগের মধ্যে সাম্য থাকে ; রোমাণ্টিসিজম্-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুকে ছাড়িয়ে রূপের, প্রতীককে ছাড়িয়ে আত্মার অতিক্রমণীয়তায়। অর্থাৎ ভাবকে প্রতিফলিত করবার বস্তুর যে দীনতা সেখানেই রোমাণ্টিসিজম্-এর চরম সার্থকতা। সংক্ষেপে এই হল দার্শনিক হেগেলের মত। হেগেলীয় শিল্প পারমার্থিক।

শিল্পের এই হেগেলীয় বিশ্লেষণের বহু ত্রুটি আছে। শিল্পের তিনটি গুণ আমরা পাই—ভাব, প্রতীক বা বস্তু (matter) ও প্রতিফলন। এর মধ্যে শেষোক্ত গুণটিই অনুধাবনীয়, কারণ এইটি হচ্ছে শিল্প বিচারের প্রকৃষ্ট প্রতিমান। ভাব বা গঠন-বস্তুর পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু বস্তুর দ্বারা ভাবের প্রতিফলন-রীতির বা এ-দুয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের যদি কোনো পরিবর্তন না হয়, তা হল শিল্পের শ্রেণী (type) ঠিকই থাকে। কবিতা ও চিত্র দুরকমের শিল্প, বিষয়বস্তু দুটিরই বিভিন্ন, কিন্তু কবিতা ও চিত্র একই শ্রেণীর শিল্প হতে পারে, যেমন ক্ল্যাসিকাল বা রোমাণ্টিক। সাহিত্যেও এই বিচার প্রযোজ্য। মহাকাব্য, নাটক ও গীতি-কবিতার মধ্যে ভাবগত ও বস্তুগত প্রভেদ থাকলেও তাদের সমশ্রেণীর শিল্প বলা যেতে পারে। ঠিক সেইরকম আবার ভাবের পরিবর্তন হলেও শিল্পের শ্রেণীর কোনো পরিবর্তন হয় না। পরমব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন শিল্পী কল্পনা করতে পারেন, কিন্তু যখন ভাবাপেক্ষা বস্তুর প্রাধান্য থাকে বেশি তখন সেই শিল্পের শ্রেণীকে বলা হয় 'ওরিয়েণ্টাল' ; বস্তু ও ভাবের মধ্যে যখন সাম্য থাকে তখন বলা হয় 'ক্ল্যাসিকাল' ; বস্তুকে ছাড়িয়ে ভাবের যখন উৎক্রান্তি হয় তখন বলা হয় 'রোমাণ্টিক'। হেগেল বলেন যে রোমাণ্টিক শিল্প হচ্ছে শিল্পের চরম পর্যায় এবং শিল্পের ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতির ফলে রোমাণ্টিক পর্যায়ে শিল্পের স্ফুরণ হয় ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে। শ্রেষ্ঠ শিল্প ও দর্শন অভিন্ন।

হেগেল শিল্পের ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে শিল্পের শ্রেণীবিভেদকে একভাবে দেখেছেন। শিল্পের ঐতিহাসিক স্তর শিল্পাদর্শের ক্রমবিকাশের উপর নির্ভরশীল এবং শিল্পের শ্রেণী নির্ণীত হয় ভাব ও প্রতিফলন-রীতির পারস্পরিক সম্বন্ধের দ্বারা। শিল্প ও শিল্প-চেতনার ক্রমবিকাশ ও ভাবের ঐতিহাসিক গতি অর্থাৎ জাতির সামাজিক চেতনায় পরমব্রহ্মের ক্রমাভিব্যক্তি—এ-দুটিই সমান্তরাল।

সুতরাং হেগেলীয় শিল্পের এই শ্রেণী-বিচার শিল্প-দর্শন নয়, কারণ শিল্প-দর্শনের জন্য প্রয়োজন হয় ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যার এবং তার উপর শিল্প-দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার। তাছাড়া শিল্পের এই হেগেলীয় যৌক্তিক (logical) বিমূর্ত (abstract) শ্রেণীবিভেদে শিল্পের মূর্তস্তবের রূপগুলি ঠিক বিশ্লেষিত হয় না। শিল্পকে যুক্তির অচলায়তনে প্রাণহীন ও গতিহীন করে রাখা হয়। ইতিহাস গতিশীল। শিল্পের উপজীব্য জীবন ও চেতনারও ক্রমবিকাশ আছে। সুতরাং শিল্পের চরম পরিণতি বস্তুজগৎ থেকে ভাবজগতে অতিক্রমণে, ধর্মলোকে ও দর্শনলোকে উৎক্রান্তিতে—হেগেলের এই যুক্তিকে অলস কল্পনা-বিলাস ভিন্ন কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। নিস্তরঙ্গ যৌক্তিক বোধের আঘাতে স্থিতি ও প্রতি-স্থিতির বিরোধ বিলীন হয়ে উচ্চতর সমন্বিত-স্থিতির সৃষ্টি হয় না। বাস্তবের মূর্ত (concrete) গতির ছন্দে, আবর্তে ও আঘাতে এই বিরোধ বিলুপ্ত হয়। শিল্প বিচারের পূর্বে হেগেল ও মার্কস্-এর ডায়লেকটিক্স-এর ব্যবধান সর্বপ্রথম বিবেচ্য।

মার্কসীয় শিল্পের আলোচনার পূর্বে শিল্প সম্বন্ধে আর একটি সম্প্রদায়ের মতও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিল্পকে এঁরা বলেন বিশুদ্ধ কল্পনা মাত্র, পার্থিব ও অতিপার্থিব জগতের বাইরে একমাত্র মনোজগতেই শিল্পের আসন। শিল্পের স্বাধীনতা (Independence of Art) ও শিল্পের খাতিরে শিল্পের (Art for Art's sake) একজন প্রধান অধিবক্তা হলন **বেনেডেটো ক্রোচে**। ক্রোচে বলেন: "Art is independent both of science and of the useful and the moral"—নৈতিক জগৎ, ব্যবহারিক জগৎ ও বৈজ্ঞানিক জগৎ থেকে শিল্প সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ক্রোচের মতে শিল্পের কোনো উদ্দেশ্য সন্ধান করা হাস্যকর। শিল্পের আধেয়কে (contents) কখনো নির্বাচন (select) করা সম্ভব নয়, কারণ সংবেদন বা প্রভাব নির্বাচনের অর্থই হচ্ছে যে সেগুলি অভিব্যক্ত। অভিব্যক্ত না হলে যা ক্রমিক ও অস্পষ্ট তার মধ্যে নির্বাচন কেমন করে সম্ভব হবে?—"A selection among impressions and sensations implies that these are already expressions, otherwise how could a selection be made among the continuous and indistinct?" কোনো বিষয়কে নির্বাচন করা সম্ভব নয় যদি তার অভিব্যক্ত রূপ আমাদের সামনে না থাকে এবং সেইজন্য ক্রোচের কাছে নির্বাচনের প্রশ্ন অবাস্তর। ক্রোচে বলেন যে সত্যকার রূপকার বিষয়বস্তুর মধ্যে নিজেকে আচ্ছন্ন দেখেন, কেমন করে

তা নিজেই তিনি জানেন না। তিনি শুধু অনুভব করেন যে সৃষ্টির সময় এগিয়ে আসছে, তাঁর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর সৃষ্টি নির্ভর করে না। "The true artist, in fact, finds himself big with his theme, he knows not how; he feels the moment of birth drawing near, but he cannot will it or not will it." সমালোচকদের উপর কটাক্ষ করে সেইজন্য ক্রোচে বলেছেন যে প্রশংসা বা নিন্দার বাক্যে শিল্পের বিষয়কে আক্রমণ করা যায় না। যখন কোনো শিল্পসমালোচক বলেন যে বিষয়ের নির্বাচন খারাপ হয়েছে তখন তিনি বিষয় নির্বাচনকে লক্ষ্য করে বলেন না, শিল্পীর সেই বিষয়ের রূপায়ণের ত্রুটীকে, অর্থাৎ বিষয়বস্তুর বিরোধিতার দোষে দুষ্ট প্রকাশের ব্যর্থতাকে লক্ষ্য করে বলেন। এখানে বুঝতে হবে যে সে-শিল্পীর উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি অভিন্ন। কিন্তু এই সমালোচকেরা যদি শিল্পীর বিষয়কে লক্ষ্য করে নিন্দা করেন এবং তার প্রকাশের পটুতাকে স্বীকার করেও সেই বিষয়ের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তা হলে অন্যায় হবে। অভিব্যক্তি যদি পরিপূর্ণ হয়, সমালোচকদের উচিত শিল্পীকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া, কারণ তাঁর আত্মাকে যা বিচলিত করবে তিনি তা থেকেই অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবেন। শিল্পীকে দোষ না দিয়ে সমালোচকদের উচিত পরিবেষ্টনকে ও সমাজকে পরিবর্তন করা। কুৎসিত কিছু যদি এ-পৃথিবীতে না থাকে তা হলে শিল্পীরও রুচির বিকৃতি ঘটবে না বা তিনি নিরাশ হবেন না, বরং সুন্দর, সরল ও সংযমী হয়েই সৃষ্টি করবেন।

...if these expressions really are perfect, there is nothing to be done but to advise the critics to leave the artists in peace, for they can only derive inspiration from what has moved their soul. They should rather direct their attention towards effecting changes in surrounding nature and society, that such impressions and states of soul should not recur. If ugliness were to vanish from the world, if universal virtue and felicity were established there, perhaps artists would no longer represent perverse or pessimistic, but calm, innocent and joyous feelings, Arcadians of real Arcady. (Æsthetic—Benedetto Croce)

কুৎসিত শিল্প বা সুন্দর শিল্প বলে কিছু নেই। শিল্পী যদি কুৎসিতই তাঁর আত্মায় উপলব্ধি করেন, তিনি তাকেই রূপ দেবেন, কিন্তু রূপায়িত যখন সে

হল তখন আর কুৎসিত রইল না, তখন হল শিল্প। শিল্পী এ-পৃথিবীর মানুষ। তাঁর পরিবেষ্টন, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সব মিলিয়ে তাঁর জগৎ। পরিবেষ্টনের পরিবর্তন হলে তার বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হবে, কিন্তু পরিবেষ্টন ছাড়িয়ে তিনি অন্য কোনো বিষয় নির্বাচন করতে পারেন না। ক্রোচের এই কথাটি বিশেষভাবে বিবেচ্য, কারণ তিনি শিল্পকে আত্মাভিমুখী বললেও পরিবেষ্টনকে অস্বীকার করেননি। তবে লক্ষণীয় হচ্ছে যে সমাজ বা পরিবেষ্টন ও শিল্পী এ-দুয়ের মধ্যে তিনি শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যার ফলে সমাজ বা প্রতিবেশ ম্লান হয়ে গিয়েছে এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ক্রোচে শিল্পের বিচার করেননি।

ভাষা ও ভাব ক্রোচের কাছে অভিন্ন। কোনো কবির রসোপলব্ধি হলে অনুরূপ ভাষার ভিতর দিয়ে তাঁর সেই উপলব্ধি হয়ে থাকে। তেমনি কোনো চিত্রকরের হয় অনুরূপ বর্ণবিন্যাসে এবং গায়কের হয় অনুরূপ স্বর-সঙ্গতিতে। যখন কোনো বিষয় শিল্পী উপলব্ধি করেন তখন তার রূপ তাঁর কাছে ব্যক্ত রূপ, অন্তর বা বাহির বলে কিছু নেই। ভাষাকে সেইজন্য ক্রোচে বলেছেন "চিরন্তন সৃষ্টি" (perpetual creation) এবং "আদর্শ ভাষা"— model language) কিছু হতে পারে না। ভাষা বেগবান, প্রাণবান, তাকে শীলমোহর করে হাটের মাঝখানে পণ্যদ্রব্যের মতো যাচাই করা যায় না, সমালোচকদেরও উচিত নয় এই শীলমোহর করা ভাষা দিয়ে শিল্পীর ছন্দোময়, প্রাণময় ভাষার বিচার করা।

প্রগতি শিল্প। সাধারণত শিল্পের প্রগতি বলতে আমরা শিল্পের সরল অগ্রগতি বুঝি। কিন্তু ক্রোচে বলেন শিল্পের প্রগতি সেভাবে হয় না। শিল্পের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শিল্পের "প্রগতি চক্র" (Progressive Cycles) আছে, প্রত্যেক চক্রের নিজস্ব সমস্যা আছে এবং সেই সমস্যার সঙ্গে সম্বন্ধের দিক থেকে প্রত্যেক চক্র প্রগতিপন্থী। কোনো একটি বিশিষ্ট যুগের একই সমস্যা বা বিষয়বস্তুকে রূপ দেবার জন্য বহু শিল্পী সচেতন, কিন্তু কেউ তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে রূপায়িত করতে পারছেন না, যতক্ষণ এই অবস্থা থাকে ততক্ষণ বলা যায় যে সেই চক্রের প্রগতি আছে। যখনই কোনো নূতন শিল্পী সেই সমস্যাকে পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত করেন তখন আর প্রগতি থাকে না, সেই চক্রটি পূর্ণতা লাভ করে। আবার নূতন চক্র আরম্ভ হয় নূতন বিষয়বস্তু, নূতন সমস্যা নিয়ে। ক্রোচে বলেন যে বিষয়বস্তু যদি এক না হয় তা হলে কোনো প্রগতি-

চক্র থাকতে পারে না। এ কথা বলা যায় না যে সেক্সপীয়র (Shakespeare) দাঁতের (Dante) তুলনায় প্রগতিপন্থী, বা গয়েটে (Goethe) সেক্সপীয়রের তুলনায় প্রগতিপন্থী। বরং বলা যেতে পারে, সঙ্কীর্ণ অর্থে, যে মধ্যযুগীয় শিল্পীর চাইতে দাঁতে প্রগতি নির্দেশ করেন এবং সেক্সপীয়র করেন এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের থেকে। সেইজন্য যুক্তির দ্বারা বা কোনো অপরিবর্তনীয় মাপকাঠির দ্বারা শিল্পের প্রগতি নির্দেশ করা ভুল। ক্রোচে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেছেন যে অনেকে বলেন জ্যোত্তোর (Giotto) যুগ ইতালীর শিল্পের শৈশব এবং র‍্যাফেল (Raphel) ও টিশিয়ান এ (Titian) তার যৌবন। এই কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে অনুরূপ অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও জ্যোত্তোর শিল্প পূর্ণতা লাভ করেনি। অবশ্য কেউই অস্বীকার করবেন না যে জ্যোত্তো র‍্যাফেলের মতো মূর্তি আঁকতে পারতেন না, বা টিশিয়ান-এর বর্ণকুশলতাও তাঁর ছিল না। কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার্য নয় যে জ্যোত্তোর মতো ছবি র‍্যাফেল বা টিশিয়ান কল্পনাও করতে পারেননি। জ্যোত্তোর অন্তর দৈহিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করেনি, রেনেসাঁস-এর যুগের শিল্পীরা দৈহিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকে পটে ও পাথরে রূপায়িত করেছিলেন। সুতরাং কোন্ মাপকাঠির সাহায্যে এদের তুলনামূলক বিচার করা যেতে পারে? ক্রোচে সেইজন্য হেগেলীয় শিল্পবিভাগকে ভুল প্রতিপন্ন করেছেন।

The celebrated divisions of the history of art into an oriental period, representing a lack of equilibrium between idea and form, the latter dominating, a classical, representing a new lack of equilibrium between idea and form, the former dominating, suffer from the same defect. (Æsthetic—Benedetto Croce)

কাল মার্কস্। হেগেল ও মার্কস্-এর মধ্যে বিরোধ দুজনের ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যার ব্যবধানের মধ্যেই সুপরিস্ফুট। হেগেলের কাছে ইতিহাস হচ্ছে আত্মার জয়যাত্রা পূর্ণমুক্তির উদ্দেশ্যে। এই মুক্তি আত্মচেতনায় লভ্য এবং পরম আত্মচেতনা হচ্ছে পরমেশ্বর, সুতরাং ইতিহাস হচ্ছে এই আত্মচেতনার ইতিহাস অর্থাৎ পরমেশ্বরের আত্মজীবনী। হেগেলীয় যুক্তির এই গণ্ডির মধ্যে সমগ্র বিশ্ব পর্যবসিত, এর বাইরে পরিত্রাণের পথ নেই। সাধারণে বলবেন এ কথা মিথ্যা, এই কাঠামোর বাইরের জগতেই তো আমরা বাস করি, যেখানে দুঃখকষ্ট,

অত্যাচার, অনাচার, অবিচার সবই আছে, বিচার যেখানে পাশবিক শক্তিতে মূর্ত হয়ে ওঠে। হেগেল এ-কথার উত্তরে বলবেন যে আমাদেরই ভুল, এ আর কিছু নয়, "die List der vernunct"—the cunning of reason, যুক্তির শঠতা। 'যুক্তি' শুধু শক্তিমান নয়, শঠও বটে। যুক্তি শঠতা করে এইসব অন্যায় অবিচারের প্রশ্রয় দেয়, স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহে বাধা দেয় না, কারণ সে জানে যে এ-সবের ধ্বংস অনিবার্য, বিপ্লবেই হোক আর প্রতিক্রিয়াতেই হোক। অর্থাৎ আরও প্রাঞ্জল ভাষায় হেগেলের এই যুক্তির শঠতার অর্থ হচ্ছে যে পরমেশ্বর যে সবসময় তাঁর বিচার সরলভাবে করবেন এমন নয়, মাঝে-মধ্যে তিনি ধূর্তামিও করেন, মানুষকে প্রশ্রয় দেন। কিন্তু আসলে তাঁর উদ্দেশ্যই সার্থক হয়, মানুষের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়। হেগেলের এই ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যাকে কার্ল মার্কস্ বলেছেন

> An esoteric, speculative history preceded the exoteric empirical history... . the history of man is transformed into a history of abstraction. . Instead of living in a real, objective world and conditioned by it, Hegel transforms man into an attribute of self-consciousness. He turns the world upside down.

আত্মচেতনাকে মানুষের আত্মচেতনা না ভেবে, মানুষকে এই পৃথিবীর মানুষ না ভেবে, বহির্জগতের অস্তিত্বকে এবং মানুষের চিন্তাধারা ও কর্ম-ধারাকে এই জগৎসাপেক্ষ স্বীকার না করে, হেগেল মানুষকে আত্মচেতনার গুণবিশেষ বলেছেন এবং জগৎকে উল্টিয়ে দেখেছেন। হেগেলের কাছে ভাব হচ্ছে এই বাস্তব জগতের স্রষ্টা, ভাবের প্রতিচ্ছবি জগৎ। মার্কস্ বলেন এই জগৎই মানুষের মনে প্রতিফলিত হয়ে ভাবে রূপ পরিগ্রহ করে। হেগেলের কাছে সেইজন্য ইতিহাস হচ্ছে পরমেশ্বরের আত্মজীবনী, মার্কস্-এর কাছে ইতিহাস মানুষের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও ক্রমবিকাশের ইতিকথা।

বস্তু ও ভাবের সম্বন্ধ বিচার করে মার্কস্ বলেছেন: Being determines consciousness. শিল্পীর সৃজনী-প্রতিভার উৎস বাস্তব জগৎ। কারণ সমস্ত কাল্পনিক সৃষ্টি শিল্পী যে-জগতে বাস করেন তার প্রতিভাসিত রূপ। সে-জগতের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্য, সে-জগতের প্রতি তাঁর ভালবাসা, ঘৃণা, তাই তাঁর শিল্পের উপাদান। বুর্জোয়া সমালোচকেরা বিদ্রূপ করে বলে থাকেন যে মার্কস্-

এর মতে শিল্প মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতিচ্ছবি। মার্কস্ কোনোদিন এমন অর্থহীন উক্তি করেননি। মার্কস্ তাঁর "Critique of Political Economy"-র ভূমিকাতে বলেছেন যে বাস্তবজীবনের উৎপাদন-প্রণালীই সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও প্রাজ্ঞিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চেতনা মানুষের অস্তিত্বের বিধাতা নয়, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই মানুষের চেতনার স্রষ্টা। ক্রমাবর্তনে সমাজ এমন একটি স্তরে পৌঁছয় যখন উৎপাদনের বাস্তব শক্তিগুলির সঙ্গে, অর্থাৎ সামাজিক ক্রমোন্নতির জন্য যে-শক্তিগুলির সৃষ্টি হয়েছে তাদের সঙ্গে, সমাজের প্রচলিত উৎপাদন-প্রণালীর সংঘর্ষ হয় এবং পরে সামাজিক বিপ্লব দ্বারা প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়ে নূতন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মার্কস্ বলেছেন

In considering such revolutions the distinction should always be between the material revolution in the economic conditions of production which can be determined with the precision of natural science, and the juridical, political, religious, æsthetic or philosophic,—in short, ideological forms—in which, men become conscious of this conflict and fight it out.

মার্কস-এর এই উক্তিকে অনেক সময় বুর্জোয়া সমালোচকেরা উপেক্ষা করেন এবং তথাকথিত "নয়া সমাজতন্ত্রীরা" কদর্থ করেন।

জেমস্ টি. ফ্যারেল্ (James T. Farrell) তাঁর "A Note on Literary Criticism" নামক পুস্তকের মধ্যে মার্কসীয় সমালোচনার তিনটি প্রধান ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন: (১) Functionalism, (২) Impressionism ও (৩) Literary Eschatology. এই তিনটি ত্রুটিকে মার্কসীয় সমালোচনার ত্রুটি না বলে, বুর্জোয়া সমালোচকদের সাহিত্যের ও শিল্পের ভুল মার্কসীয় ব্যাখ্যা বলাই ঠিক। মার্কস্ বা এঙ্গেলস্-এর কদর্থ করা হয় বলে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুল বলা মূর্খতা। Functionalism অর্থে ফ্যারেল বলেছেন কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন বা প্রচারকার্যের দ্বারা সাহিত্যের উৎকর্ষতা যাচাই করা। Impressionism অর্থে বলেছেন সাহিত্যের বা শিল্পের প্রভাব দ্বারা সাহিত্য বা শিল্প বিচার করা। আর দু'শ বা তিনশ বছর পূর্বের শিল্পীদের বর্তমান সমাজের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করাকে ফ্যারেল Literary Eschatology বলেছেন।

ফ্যারেল যাকে Functionalism বলেছেন মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ কোনোদিন তা সমর্থন করেননি। আর্নল্ড রুজ (Arnold Ruge), বোর্ন (Borne), স্টাহ্‌র (Stahr) প্রমুখ "তরুণ হেগেলীয়ান"রা একসময় সমাজ ও রাষ্ট্র-বিমুখতার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন এবং শিল্পীর এইজাতীয় মনোভাব দেখলে তাঁরা কটূক্তি করতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁরা বলতেন যে শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকবে, রাজনীতিকে উপেক্ষা করলে জীবনকেও উপেক্ষা করা হয়। বিশিষ্ট "তরুণ হেগেলীয়ান" স্টাহ্‌র বলেছিলেন :

> The dogma has long enough prevailed among Germans that poetry and politics have nothing to do with one another, that political stuff can never serve as poetic material. But why ? Have not the masterpieces of epic and dramatic poetry of all ages sprung from such soil ?

জার্মানদের মধ্যে বহুদিনের সংস্কার রয়েছে যে কবিতা ও রাজনীতির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই এবং রাজনৈতিক বিষয় কখনো কবিতার উপকরণ হতে পারে না। কিন্তু কেন হতে পারে না ? সমস্ত যুগের প্রসিদ্ধ মহাকাব্য ও নাট্যকবিতার উপাদান কি রাজনীতি ছিল না ? এইভাবে তর্ক করে তাঁরা গয়েটেকে (Goethe) পর্যন্ত নির্মমভাবে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কার্ল মার্কস্ ও ফ্রিড্রীশ্ এঙ্গেলস্ এই সমালোচনার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তীব্র প্রতিবাদ জানান। এঙ্গেলস্ ১৮৪৭ সালে গয়েটে সম্বন্ধে তথাকথিত "Real Socialist"-দের এই প্রলাপোক্তির নিন্দা করে বলেন যে এইসব ভাবপ্রবণ সমাজতন্ত্রীরা "Goethe, the phillistine" এবং "Goethe, the poetic genius"-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তাকে ভুলে যান। লেনিন (Lenin) টলস্টয়কে (Tolstoi) বলতেন "the hysterical misery-mongering intellectual", কিন্তু তাঁকে শিল্পী হিসাবে "mirror of revolution" বলতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। "Proletarii" পত্রিকায় ১৯০৮ সালে টলস্টয় সম্বন্ধে লেনিন লিখেছিলেন

> Tolstoi reflected the accumulated hate, the ripened aspiration for a better life, the desire to throw off the past—and also the immaturity, the dreamy contemplativeness, the political inexperience, the revolutionary flabbiness of the village.

জার্মানিতে ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত যে সাহিত্য আন্দোলন হয়েছিল সে-সম্বন্ধে ১৮৫১ সালে এঙ্গেলস্ "New York Tribune" পত্রিকায় লিখেছিলেন

> A crude constitutionalism, or a still cruder republicanism, were preached by almost all writers of the time. It became more and more the habit, particularly of the inferior sorts of literati, to make up for the want of cleverness in their productions, by political allusions which were sure to attract attention. Poetry, novels, reviews, the drama, every literary production teemed with what was called 'tendency', that is, with more or less timid exhibitions of and anti-Governmental spirit.

উদ্দেশ্যমূলক (tendentious সাহিত্যকে এঙ্গেলস্ নিন্দা করেননি। এই প্রবন্ধ লেখার প্রায় চল্লিশ বছর পরে বালজাক্ (Balzac) সম্বন্ধে মিস্ হার্কনেসকে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন

> I think that tendency should arise of itself out of the situation and action, without being specially emphasised, and that an author is not obliged to give the reader a ready-made historical future solution of the conflicts he depicts... Therefore in my view the Socialist tendentious novel completely fulfils its mission in describing real relalationships, in destroying relative illusions concerning them, in unsettling the optimism of the bourgeois world, in sowing doubt as to the eternal nature of the existing social order, even though the author did not thereby advance any definite solution and sometimes did not even come down on one side or other.

উদ্দেশ্যমূলক শিল্প ও সাহিত্য হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্যকে প্রচার করা শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না। উদ্দেশ্য স্বতঃই ফুটে উঠবে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শিল্পীর সমস্যা সমাধানেরও কোনো দায়িত্ব নেই। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য বা শিল্প হতে হলেই যে নায়কনায়িকার মুখ দিয়ে সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে হবে তারও কোনো বাধ্যতা নেই। সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা করা চলতে পারে, প্রত্যেক শ্রেণীর ভুল ধারণাকে নির্দেশ

করা যেতে পারে, বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বপ্নসৌধকে ভেঙে চুরমার করা যেতে পারে এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে শিল্পী একটি বিরাট প্রশ্ন করেও ছেড়ে দিতে পারেন, সমাধান যে দিতেই হবে এমন নয়। সুতরাং মার্কসীয় সমালোচনা সম্বন্ধে Functionalism-এর যে অপবাদ তা বুর্জোয়া সমালোচকদেরই আবিষ্কার এবং উগ্র সমাজতন্ত্রীদের কুব্যাখ্যার ফল।

Literary E chatology-ও মার্কসীয় সমালোচনার ত্রুটি নয়, তার কদর্থ। বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে শিল্পীর, কিন্তু সে-যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে বা যান্ত্রিকভাবে নেই। মার্কস্‌কে এ-কথা বললে মার্কস্‌ নিশ্চয়ই বিদ্রূপ করতেন যে যেহেতু সামন্ততন্ত্রের (Feudalism) পরবর্তী পর্যায় ধনতন্ত্র (Capitalism), বা ধনতন্ত্রের পরবর্তী পর্যায় সমাজতন্ত্র (Socialism), সেই হেতু সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক শিল্প ধনতান্ত্রিক শিল্পে রূপধারণ করবে বা ধনতন্ত্রের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক শিল্প সমাজতান্ত্রিক শিল্পে রূপ গ্রহণ করবে। মার্কস্‌ এ-কথাও বলেননি যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালী অপেক্ষা উন্নততর বলে, ধনতান্ত্রিক শিল্পও সামন্ততান্ত্রিক শিল্পের তুলনায় উন্নততর। শিল্পকে প্রত্যেক ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গে, অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যা, সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক শক্তির সঙ্গে তুলনা করে বিচার করতে হবে। যুগ পরিবর্তনের সময় বা পরিবর্তনের পর শিল্পীরা সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে উপলব্ধি করতে পারেন না। নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব থাকেই এবং শিল্পী এই দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করে তাকে জয় করেন।

হেগেল ও মার্কস্‌-এর দৃষ্টিকেন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীত—শূন্য ও মর্ত। ক্রোচের সঙ্গেও মার্কস্‌-এর বৈসাদৃশ্য আছে। ক্রোচে শিল্পের সরল প্রগতিকে স্বীকার না করে তার চাক্রিক প্রগতিকে স্বীকার করেছেন, মার্কস বলেছেন সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ও নূতনের ক্রমোপলব্ধি। একযুগের তুলনায় অন্যযুগের শিল্পকে উন্নততর বলা ভুল এ-কথা ক্রোচে প্রতিপন্ন করেছেন, মার্কস্‌-ও অস্বীকার করেননি। কিন্তু ব্যক্তিকে স্বীকার করেও মার্কস্‌-এর কাছে সমাজ মুখ্য, ক্রোচের কাছে ব্যক্তিসর্বস্ব। ক্রোচের শিল্প-দর্শন ইতিহাস-শূন্য, মার্কস্‌-এর শিল্প-দর্শন ইতিহাস-আশ্রয়ী। মার্কস্‌ বলেছেন যে মানুষের অনবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলে সমাজের রূপান্তর ঘটে, আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং শিল্পীও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, নূতন পুরাতনের বিরোধ-বন্ধুর পথে ক্রমে

সেই পরিবর্তনকে স্বীকার করেন। সামাজিক বিপ্লবের পর বা বিপ্লবের প্রস্তুতির সময় শিল্পীর মনেও বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং শিল্পী সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাকে জয় করবার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিবেষ্টনের মধ্যে মার্কস্ শিল্পকে সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণীর অভিব্যক্তি আখ্যা দিয়েছেন এবং সেইজন্য শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ যেখানে বর্তমান সেখানে শ্রেণী-শিল্প (Class Art) ভিন্ন অন্য কিছু বিকশিত হতে পারে না। কারণ মার্কসীয় সংজ্ঞানুসারে শ্রেণী হচ্ছে একদল ব্যক্তি যাদের জীবন-অভিজ্ঞতার মূলত ঐক্য আছে, অর্থাৎ অন্যশ্রেণীর জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই শ্রেণীর বহির্বিভেদ যত বেশি তার চাইতে অন্তর্বিভেদ অনেক কম। এই বিভেদের মূলে থাকে বাস্তব অর্থনৈতিক উৎপাদন-প্রণালী। সেইজন্য শিল্পীর দ্বারা নূতন অভিজ্ঞতার সাকল্য (integration) এবং যে-শ্রেণীর সঙ্গে তার জীবন-অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য আছে, সেই শ্রেণীরই চেতনা অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীই শিল্প অনুশীলন করে, কারণ সমাজের স্বাধীনতা ও সচেতনতার অধিকারী যারা তারা এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক যুগের শাসকশ্রেণী হচ্ছে এই শ্রেণী। শিল্পের গতি নির্ণয়ের এই হচ্ছে মার্কসীয় পন্থা।

দার্শনিক হেগেল যুক্তির অচলায়তনে ইতিহাসকে বন্দী করে বললেন, ঐশীচেতনার ক্রমবিকাশ হচ্ছে মানুষের ইতিহাস, এ-পৃথিবী সেই চেতনার প্রতিচ্ছায়া। আদিম যুগে বস্তুর প্রাধান্য থেকে, বস্তু ও ভাবের সম্যাবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষ ভাব দ্বারা বস্তুকে পরাজিত করে। এই বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিফলিত রূপ হচ্ছে শিল্প। ওরিয়েণ্টাল্ ও ক্ল্যাসিক্যাল্ স্তর অতিক্রম করে শিল্প যখন রোমাণ্টিক স্তরে উন্নীত হয় তখন শিল্প ও দর্শন অভেদাত্মা। বেনেডেটো ক্রোচে বলেন শিল্প স্বোৎসারিত, অহম্-সর্বস্ব, স্বোত্তর কোনো অতি-পার্থিব জগতে শিল্পের উৎস বা পরিপূর্ণতা সন্ধান করা বৃথা। শিল্প উদ্দেশ্য-বর্জিত। শিল্পী সামাজিক শুভাশুভ চেতনার ঊর্ধ্বে। শিল্পের ইতর-বিশেষ নেই। কার্ল মার্কস্ বলেন শিল্প সমাজোদ্ভূত, শিল্পী সমাজ-সচেতন। বস্তুর জনিতা ভাব নয়, ভাবের জনিতা বস্তু। বস্তুজগৎই শিল্পের উৎস। কিন্তু শিল্পী আজ্ঞাবাহী নন, বা সমস্যার ক্রীতদাসও নন। সমাজের একাগ্রতাকে তিনি উপলব্ধি করে রূপায়িত করেন। সমাজের বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন রূপ ও ব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পীর অন্তর ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত এবং সামাজিক ক্রমবিকাশে যুগে যুগে শিল্পীরা তাঁদের অনুভূতি ও

মানসিক বিরোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অর্থে সমাজসংগ্রামে তাঁরাও সৈনিক। শিল্পী যদি তাঁর যুগ-সমস্যার প্রতি ও যুগাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান হন,—সত্যকার শিল্পীকে হতেই হবে,—তা হলে তিনি সেই যুগে প্রগতিপন্থী। অস্তমান্ ধনতান্ত্রিক যুগে একজন হয়তো গাইবেন আসন্ন সমাজতন্ত্রের প্রভাতী, আর একজন গাইবেন ধনতন্ত্রের পূরবী। কেউ হয়তো ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের বিরোধী সমস্যার আবর্তে দিকভ্রষ্ট হয়ে মনের বন্দর খুঁজে পাবেন না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবেন, প্রলাপ বকবেন, বা নিজের একটি কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করে সেখানে আশ্রয় নেবেন। প্রথম দুজনের একজন আশাবাদী (optimist) এবং আর একজন নৈরাশ্যবাদী (pessimist) হলেও, প্রগতি-পন্থী দুজনেই, কারণ দুজনেই বর্তমান সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং তার মূর্ত শক্তিগুলির প্রতি নিষ্ঠাবান। একজন ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল, তাই তাঁর মধ্যে ভবিষ্যতের ব্যঞ্জনা (suggestion) থাকে; আরএকজন বর্তমানের বীভৎসতায় জর্জরিত, তাই তাঁর মধ্যে বর্তমানের প্রতি বক্রোক্তি ও শ্লেষ থাকে। তৃতীয়জন হচ্ছেন পরিত্রাণকামী (Escapist), কিন্তু তা হলেও তিনি প্রতিভাবান শিল্পী হতে পারেন, যে-প্রতিভার সার্থকতা শুধু তার নিজের কাছে।

সংক্ষেপে শিল্প ও সাহিত্যের এই হল মার্কসীয় বিশ্লেষণ।

তৃতীয় অধ্যায়

সত্য ও বাস্তব

যখন আমরা বলি 'মানুষ' তখন সহজাত-প্রবৃত্তি-সংগত ব্যক্তিকে বুঝি, যে-ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে ইচ্ছামতো বর্ধিত হতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে মানুষ সেভাবে বর্ধিত হয় না, কোনো বিশেষ সমাজের মধ্যে বিশেষ মানুষরূপেই সে আত্মপ্রকাশ করে। জন্মগত বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকে, কিন্তু সমাজ সেই বৈশিষ্ট্যের বিরোধী নয়। উপরন্তু সভ্যতার ক্রমাবর্তনে যে বিভেদের (differentiation) সৃষ্টি হয় তাতে মানুষের এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করবার পথ আরও প্রশস্ত হতে থাকে। মানুষকে সেইজন্য সহজ-প্রবৃত্তির সমষ্টি হিসাবে দেখা যায় না, কোনো বিশেষ সভ্যতা-প্রসূত মানুষ হিসাবেই দেখা যায়। সে-মানুষের সচেতনতা অন্য মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ-সাপেক্ষ।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অর্থাৎ বহির্জগতের সংগ্রামের প্রারম্ভ থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই পারস্পারিক সম্বন্ধ স্থাপনের সূচনা। ব্যক্তি কতকগুলি নিয়মাধীন—শারীরিক (Physiological) ও মনস্তাত্ত্বিক (Psychological)। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি, অর্থনৈতিক উৎপাদন-প্রণালীর ভিতর দিয়ে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই অনুপ্রবেশের (inter-penetration) ফলে সে যে নূতন নিয়মের অনুবর্তী হয়েছে তার নাম সমাজনীতি (Sociology)। এই তিনটি নিয়ম—শারীরনীতি (Physiology), মনোনীতি (Psychology) ও সমাজনীতি (Sociology)—পরস্পর-বিরোধী নয়। এদের পরস্পর-মিলনে ও সহযোগিতাতে একদিকে এই নিয়মগুলি যেমন পরিবর্ধিত হয়েছে, তেমনি আর একদিকে মানুষিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি যুগে যুগে মহিমামণ্ডিত হয়ে অগ্রসর হয়েছে।

ভাবজগতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই সংগ্রামের প্রতিভাত রূপ হচ্ছে বাস্তব (Reality) বা সত্য (Truth)। এই বাস্তব বা সত্য ঊর্ধ্বে শূন্য থেকে মানুষের কোলে নিক্ষিপ্ত হয় না, মানুষই একে সৃষ্টি করে এবং সেইজন্য এ-সত্য জীবন্ত, বর্ধিষ্ণু ও পরিবর্তনশীল। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম যত জটিলতর হতে থাকে তত সুন্দরতর ও আপাত-বিরুদ্ধরূপে এই সত্য মানুষের মনে

প্রতিভাত হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক মানুষের মনে এই সত্যের মাত্র আংশিক প্রতিভাসন সম্ভব। বিকৃত, আংশিক ও সীমাবদ্ধ এই প্রত্যক্ষ বাস্তব ক্রমে বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সত্যের শরীরে মূর্ত হয়ে ওঠে, যেহেতু এ-সত্য সমসাময়িক সামাজিক পরিবেষ্টন-উদ্ভূত এবং সামাজিক পরিবেষ্টনের ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থা। কড্‌ওয়েল্ বলেছেন

Thus at any time truth is the Special Complex formed by the partial reflections of reality in all living men's heads—not as a mere lumping together, but as these views are organised in a given society ..." (Christopher Caudwell—Illusion and Reality)

প্রত্যেক মানুষের মনে "সত্য" দু'রকম উপায়ে জন্ম নেয়—অনুভূত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাস্তবে (Perception) এবং স্মৃতিতে (Memory) অর্থাৎ অতীত অনুভূতির প্রভাবে। সমাজে পারস্পরিক সঙ্গপ্রভাবের ফলে মানুষের চেতনা ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকে এবং স্মৃতি ও অনুভূতিও সমাজের পেষণে পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত হতে থাকে। এইজন্যই ব্যক্তির চেতনা হচ্ছে সমাজোৎপন্ন। পরম সত্য (Absolute Truth) বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। বাস্তবের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের ফলে সত্যের জন্ম হয় এবং সংগ্রামের স্তরে স্তরে উন্নততর বাস্তব অবস্থার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সত্যও জটিলতর হতে থাকে। বাস্তবের উন্নতির পাশাপাশি সত্যও উন্নীত হয় এবং তার লক্ষ্যও উচ্চতর হতে থাকে। মানুষ যত দীর্ঘতর হতে থাকবে ততই তার পূর্ণাবয়ব নিজের দৃষ্টিপথে ভেসে উঠবে, এ-কথা প্রতিপন্ন করা যেমন হাস্যকর ও অর্থহীন, তেমনি 'পরম সত্য' সমাজলভ্য বলাও মূর্খতার নামান্তর।

মানুষের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার্য নয়। সামাজিক পরিবেষ্টনে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে মানুষের এই স্বাতন্ত্র্য স্ফূর্তি পায়, সমাজের রূপান্তর ঘটে। এই পারস্পরিক যোগাযোগের মূলে রয়েছে মানুষের জীবিকা-সংগ্রাম, অর্থাৎ সমসাময়িক সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা। এই উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ নূতন নূতন রূপ ধারণ করে, সেই সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিবর্তন হয়, স্বাতন্ত্র্যেরও রূপ বদলায়। শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর, অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর মধ্যেই এই স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য শ্রেণীর অর্থাৎ শাসিত ও শোষিত শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা মুকুরে প্রতিফলিত রূপের মতো অলীক। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবাধ স্ফূর্তি একমাত্র শ্রেণীহীন

সমাজেই সম্ভব, যেখানে মানুষ বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর একজন, বিশেষ শ্রেণী-সচেতন জীব নয়। সত্যও কখনো মানুষের দিক থেকে চরম সত্য হতে পারে না, সাময়িক সত্য হতে পারে। বাস্তবের অগ্নিগহ্বর থেকে যে-সত্যের জন্ম হয়, বাস্তবের রূপাবর্তনে সে-সত্যেরও রূপান্তর ঘটে, এক সত্য অন্য সত্যে মূর্তি পরিগ্রহ করে। অভিজ্ঞেয়, জগৎ-সাপেক্ষ এই জীবন্ত সত্য আদর্শবাদীর নভোচারী অজ্ঞেয় "পরম সত্য" নয়। অধ্যাপক হেন্‌রী লেভীর ভাষায় বলতে হয়

> If we must answer the question, what is truth? We would say, truth is the summation of man's experience at any given moment, truth is a lantern that illuminates his next few steps, past truth becomes incomplete as a greater truth replaces it, truth is an instrument for the creation and working out of a human purpose, becoming sharper and more effective as that purpose becomes itself clearer, and as man's reading of natural process becomes more and more accurate.
>
> —H. Levy : A Philosophy for a Modern Man

সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বলতে হবে যে, সত্য হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের অভিজ্ঞতা-সমষ্টি, সত্য হচ্ছে সেই প্রদীপ যার শিখা-বিচ্ছুরিত আলোকসম্পাতে মানুষের পরবর্তী চলার পথ দৃষ্টি-গোচর হয়, সত্য হচ্ছে মানুষের উদ্দেশ্য সৃষ্টির ও সাধনের অস্ত্র, উদ্দেশ্য স্পষ্টতর হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের প্রাকৃতিক গতি অধ্যয়নের যাথার্থ্যের সঙ্গে যে-অস্ত্র ক্রমে তীক্ষ্ণতর ও শক্তিশালী হতে থাকে। সত্য হচ্ছে সংগ্রামরত সামাজিক মানুষের অস্ত্র, বন্ধুর পথ কেটে যে-অস্ত্র সুগম করে দেয়। সত্য হচ্ছে উদ্দেশ্য-মুখর, আকাঙ্ক্ষানুরণিত মানব-জীবনের সূর্য, যার জ্যোতিস্নাত পথে মানুষ দুর্গমতা দূর করে অগ্রসর হয়, উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে, সাধন করে। সত্য অপরিবর্তনীয় ও নিরলম্ব নয়। সত্য পরিবর্তনশীল, ক্রমবিবর্ধমান ও সমাজাশ্রয়ী।

প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত সংগ্রামে মানুষ যে পরিবর্তনশীল উপায় উদ্ভাবন করেছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান উপায় হচ্ছে ভাষা (Language)। একা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়, সহযোগিতা আবশ্যক। এই সহযোগিতা লাভের একমাত্র উপায় হল ভাষা। কি ভাবে সত্য ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে?

শব্দ (Word) হচ্ছে ইঙ্গিত বা ধ্বনি। আসন্ন বিপদের সময় একপাল পশু চিৎকার করে ওঠে। একটি পশু চিৎকার করলেই আদিম অনুভূতির বশে

সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে। সুতরাং চিৎকারের একটি আন্তরিক (Subjective) দিক আছে, সকলেই চিৎকারের সময় ভয় 'অনুভব' করে শব্দের আর একটি বাহ্যিক (Objective) দিকও আছে। এই চিৎকার ভীতিপ্রদ কোনো কিছুর উপস্থিতি নির্দেশ করে, যার অস্তিত্ব বাস্তব জগতে আছে। কিন্তু পশুর পক্ষে যা চিৎকারে সঙ্কেত করা বা জ্ঞাপন করা সম্ভব, মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সামাজিক মানুষ অর্থনৈতিক সহযোগিতায় এই এই চিৎকারকে শব্দে পরিণত করেছে। এই শব্দ এখন আর সহজপ্রবৃত্তি-জাত নয়, খেয়াল ও ইচ্ছাপ্রসূত। অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিশেষ সামাজিক পরিবেষ্টনের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ থেকে হল এর উৎপত্তি ও বিকাশ। অতএব ভাষা মানুষের চেষ্টা-নিরপেক্ষ একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্র নয়। ভাষা হল energeia, অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে সহযোগিতার ফলে মানুষের সচেতন চেষ্টার প্রকাশ ভাষা মানুষেরই সৃষ্টি, প্রকৃতির অমোঘ বিধান তার মধ্যে নেই। মানুষ কোনো নির্দিষ্ট শব্দের সাহায্যে অন্য সকলের কাছে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে সক্ষম হয় যেহেতু সকলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য আছে এবং সে-শব্দ সে-অভিজ্ঞতার প্রতীক হিসাবে সকলের দ্বারাই গৃহীত হয়েছে। ঠিক তেমনি মানুষ কোনো নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারা তার অনুভূতিকে অন্য সকলের কাছে ব্যক্ত করতে পারে সকলের অনুভূতির সঙ্গে তার অনুভূতির স্বাজাত্য আছে বলে, এবং সে-শব্দ সে-অনুভূতির প্রতীক হিসাবে সকলের দ্বারা গৃহীত হয়েছে বলে। এই সামাজিক বাস্তব (Social Reality) ও সামাজিক-'অহমিকা' (Social Egoism), এতে ব্যক্তিত্ব (Individuality) কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। এই সামাজিক 'অহমিকা' ও উন্নততর সামাজিক বাস্তব আজ ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে প্রশস্ত সুযোগ দিয়েছে, সে-সুযোগকে আধুনিক যুগে অস্বীকার করা হচ্ছে। এই কথা প্রচার করা হচ্ছে যে আধুনিক সভ্যতা মানুষকে পিষে নিঙড়ে নিয়ে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে, সর্বগ্রাসী সমাজ মানুষের নিজস্বতাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। উৎপাদন-শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ক্রমোন্নতির জন্য আজ মানুষ যে কল্পনাতীত অবকাশ পেয়েছে নিজেকে প্রকাশ করবার, নিজের সঙ্কীর্ণ, অনুদারসত্তা প্রসারণের সে-সব প্রচণ্ড শক্তিকে আজ নিষ্ক্রিয় ও অপাংক্তেয় করে রেখেছে সামাজিক উৎপাদন-সম্বন্ধ। তাই আজ মানুষের বিক্ষুব্ধ অন্তর

আলোড়ন করে অহমিকার অপমৃত্যুর বিলাপ ধ্বনিত হচ্ছে। এই বিলাপ-ধ্বনি, এই ক্ষোভ ও অভিযোগ হচ্ছে প্রাচুর্যের দিনে আজ বেকার সমস্যা ও কুখাদ্যের যে-অপবাদ তারই প্রতিধ্বনি—"the ideological counterpart of denunciations and malnuitrition and unemployment in a world of plenty".

ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন-শক্তির যে বৃদ্ধি হয়েছে তাতে সামাজিক অহম্-এর (Social Ego) প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথও প্রশস্ততর হয়েছে। কিন্তু সেই বিরাট, বিপুল শক্তির রাশ টেনে রেখেছে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্বন্ধ (Productive relations)। সমাজের অন্তরে ও বাহিরে এই বিরোধের (Contradiction) প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া মূর্ত হয়ে উঠেছে বেকার সমস্যা ও বুভুক্ষার মধ্যে। আন্তরিক প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়েছে 'অনুভূতির বুভুক্ষা' (Emotional Starvation) ও ব্যক্তিত্বের বিনাশ (Crippling of Personalities), এই মর্মভেদী হাহাকারের মধ্যে। দুটিই যুগান্তকারী বিপ্লবের অগ্রদূত।

বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী আঁদ্রে জিদ্‌কে একবার একজন সমালোচক বলেছিলেন যে ১৯২৫ সালে ফরাসী কঙ্গো (French Congo) ভ্রমণের পূর্বে সামাজিক অন্যায় ও অবিচার সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। আঁদ্রে জিদ্ এ-কথার উত্তরে বলেছিলেন

This is not so. If I had simply published the whole of my notes and the diary of my journey in the period when I wrote 'Amyntas' (1893-96), in the same way as I did for my journey in the Congo, or, to be more exact, if I had given free play in my notes to everything that was on my mind at that time, you would have found in them, for example, the story of the commencement of the exploitation of the Gufsa phosphates, and, more than anything else, the story of the sinister and methodical expropriation of the small Arab farmers by the C-bank, none of which left me indifferent. But there you are! It was not *my job* I should have thought myself dishonoured as an artist if I had lent my pen to such vulgar cares. That was something for people more competent in such affairs than myself.

"তা নয়। কঙ্গো ভ্রমণ সম্বন্ধে যেমনভাবে আমি আমার ডায়রি লিখেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে যদি আমার 'আমিনট্যাস্'-এর (১৮৯৩-৯৬) কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ করতাম, যদি সেই সময় আমার মনে যে-সব ভাব ছিল সেগুলিকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতাম, তাহলে তার মধ্যে গাফ্সা ফস্ফেট্-এর শোষণ শুরু এবং আরবের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সি-ব্যাঙ্ক কর্তৃক হীন নিয়মিত উৎপাটন প্রভৃতি সবই ব্যক্ত হত, কারণ এর কোনোটির প্রতিই আমি উদাসীন ছিলাম না। কিন্তু সমস্যা এইখানে! এ-সব আমার কর্তব্য নয়। এইসব নীচ জঘন্য ব্যাপারকে কলম দিয়ে প্রকাশ করবার অর্থ হচ্ছে শিল্পী হিসাবে নিজের মর্যাদা নষ্ট করা। এসব ব্যাপার অন্য বহু উপযুক্ত ব্যক্তির চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে, কিন্তু আমার পারে না।

ফরাসী কঙ্গোতে যাত্রার পূর্বে আঁদ্রে জিদ্ পৃথিবীকে দেখতেন তাঁর অন্তরের প্রতিচ্ছবিরূপে; একমাত্র তাঁর মনোজগৎই ছিল তাঁর কাছে সত্য ও প্রকৃত, বাস্তবজগৎ তারই প্রতিবিম্ব মাত্র। তাঁর ব্যক্তিগত চেতনার বাইরে জগতের যে বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে তাকে তিনি প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করতে আরম্ভ করলেন কঙ্গো ভ্রমণের পর। কঙ্গোতে পর্যন্ত তিনি মানুষের পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে না দেখে, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, নিপীড়িত ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন। জিদ্ এ-সম্বন্ধে নিজেই সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। ১৮৯৩ সালে যখন তিনি আলজিরিয়াতে ঔপনিবেশিক শোষণ (Colonial exploitation) দেখেছিলেন, তখনো শাসনকর্তা, অর্থনীতিবিদ্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের উপর আস্থা হারাননি। তিনি ভেবেছিলেন যে এ-সব সমস্যার সমাধান করবার দায়িত্ব ও কর্তব্য এই সব বিশেষজ্ঞদের, তাঁর মতো শিল্পীর নয়। জিদ্ লিখেছিলেন

I thought that what aroused my indignation must make them indignant also and that they were better qualified than I to denounce and reform abuse, extortion, injustice and error. Then at that time I was still deplorably modest and did not yet understand that when there is no one but the victim to shout "Stop thief", he runs the risk of not being heard. In the Congo it was different. There I could have no illusion that there would be anyone to listen to the cry of the robbed. I had been told so over and over again before I left, in order to dissuade me from going. 'Don't go out there; nobody

goes out there for pleasure'. Administrators, traders, missionaries, the only representatives of France, all had their mouths closed, either out of duty or self interest. Here, where I alone was able to speak, I *had to* speak. I was not anti-imperialist when I left home, and it was not as an anti-imperialist that I denounced the abuses I had witnessed. Yes, it was not till much later that an inescapable logic led me to connect these particular abuses to a whole depolorable system and that I was brought to understand that a system which tolerated, protected and favoured such abuses because it profited from them itself, was bad from top to bottom.

"আমি ভেবেছিলাম যে আমার কাছে যা অপ্রীতিকর মনে হয়েছে তা তাদের কাছেও প্রীতিকর মনে হবে না, এবং এই সব অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার বা সেগুলিকে সংস্কার করবার যোগ্যতা আছে আমার চাইতে তাদেরই বেশি। সে-সময় আমি অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে বিনয়ী ছিলাম এবং তখনো ঠিক বুঝতে পারিনি যে যখন বিপন্নকেই চোর ধরবার জন্য চিৎকার করতে হয় তখন তার সেই অসহায় আর্তনাদ অশ্রুত থাকবারই সম্ভাবনা থাকে বেশি। কঙ্গোতে ঠিক এর বিপরীত ঘটল। এখানে শোষিতের ও পীড়িতের আবেদন একদিন যে সকলে শুনবে, এ-ভ্রান্তি আমার দূর হয়ে গেল। যাতে আমি না যাই সেজন্য আমার যাত্রার পূর্বে বারবার আমাকে এই কথা শুনানো হয়েছিল। 'যাওয়া উচিত নয়, ওখানে স্ফূর্তির জন্য কেউ যায় না।' শাসনকর্তারা, ব্যবসায়ীরা, ধর্মপ্রচারকেরা, ফ্রান্সের একমাত্র প্রতিনিধিরা সকলেই নীরব রইলেন, কর্তব্যের খাতিরেই হোক বা নিজের স্বার্থের জন্যই হোক। এখানে একমাত্র আমারই কথা বলবার ক্ষমতা ছিল এবং আমাকে কথা বলতেও হয়েছিল। দেশ থেকে যাত্রার সময় আমি সাম্রাজ্য-বিরোধী ছিলাম না, বা সে-মনোভাব নিয়ে যা দেখেছি তার প্রতিবাদও আমি করিনি। বাস্তবিক, তার অনেক পরে আমি নিজের যুক্তি দিয়ে বুঝি যে এইসব অন্যায় অবিচারের সঙ্গে কোনো একটি বিশেষ জঘন্য সমাজ-ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, এবং এও উপলব্ধি করি যে যে-সমাজ-ব্যবস্থা এই সব অন্যায়ের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয়, সে-সমাজ আগাগোড়া বিষাক্ত, ভয়াবহ।"

এই স্বীকারোক্তির মধ্যে আঁদ্রে জিদ্-এর মানসিক ক্রমবিকাশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নিজের সীমাবদ্ধ চেতনার উপচ্ছায়ার বাইরে কোনো সত্যকে তিনি স্বীকার করতেন না। ক্রমে এই শূন্যধারণাকে বর্জন করে তিনি বহির্জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করলেন এবং বুঝলেন যে ব্যক্তিক চেতনা ও স্বাধীনতার স্ফূর্তির জন্য এই বহির্জগৎকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক। তিনি বুঝলেন যে স্বাশ্রয়ী জীবনের যে-মুক্তি তা মুক্তি নয়, সত্যকার জীবনকে অস্বীকারের গ্লানিময় ভ্রান্তি। বাস্তবের উত্তপ্ত ভূমির উপর যে-সৌন্দর্য মুকুলিত হয়ে ওঠে তার স্পর্শে অবসাদ আসে না, পূর্ণ জীবনাস্বাদ পাওয়া যায়। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর নেই। মনের নেহাই-এর উপর পেটা বহির্জগতের আরএকটি রূপ হচ্ছে অন্তর্জগৎ। র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্‌স্‌ বলেছেন

> Art is one of the means by which man grapples with and assimilates reality. On the forge of his own inner consciousness the writer takes the white-hot metal of reality and hammers it out, refashions it to his own purpose, beats it out madly by the violences of thought. (Ralph Fox—The Novel and the People)

বাস্তবের আত্মীকরণ ও উপলব্ধির উপায় হচ্ছে শিল্প। শিল্পী তাঁর আভ্যন্তরীণ চেতনার নেহাই-এর উপর বাস্তবের উত্তপ্ত ধাতুকে দুর্নিবার চিন্তার আঘাতে নূতন রূপ দেন। সেই রূপই তাঁর শিল্পে মূর্ত হয়ে ওঠে। সত্যকার মহৎ শিল্পী যিনি তিনি বাস্তবের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম করবেন এবং সে-সংগ্রাম হবে বিপ্লবী সংগ্রাম, কারণ বাস্তবকে তিনি রূপান্তরিত করবেন। জীবন তাঁর কাছে হবে মুখ্যত সংগ্রাম-মুখর, সৎ ও অসৎ-এর দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে জয়যাত্রা।

প্রশ্ন হতে পারে যে সেই সংগ্রামের জন্য শিল্পীকে মার্কস্-পন্থী কেন হতে হবে? র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্‌স্‌ Times Literary Supplement-এর মার্কিন বিপ্লবী সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য দিয়ে বলেছেন যে মার্কস্-ইজম্ বা অন্য কোনো দর্শন পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন নয়, মার্কস্-ইজম্ শিল্পীর কাছে শুধু যে সামান্যরূপ (Form) হিসাবে গ্রহণযোগ্য—তা নয়, এ-যুগের শিল্পীকে এই মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে জগৎকে দেখতেই হবে। উক্ত Times Literary Supplement-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে

Art and dogmatism are as the poles opposed.. There is no reason why an artist should not be an honest artist and a Marxist at one hand and the same time, so long as the form of his Marxism does not conflict with his deepest knowledge. Every man must of necessity be blinded or blinkered by his ignorances ; he can at best but strive for a perpetual new clarification. Form of some sort is inevitable it only as mental machinery ; and to the objective view there seems no obvious reason why Marxism should not function as satisfactorily in that subordinate role—so long as it is kept subordinate as any other comparable conception.

শিল্প ও সংস্কারের মধ্যে মেরু-ব্যবধান রয়েছে। একসঙ্গে শিল্পী ও মার্কস্‌-পন্থী না হবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, যদি অবশ্য মার্কস্‌-ইজম্‌-এর সামান্যরূপের (Form) সঙ্গে শিল্পীর গভীর জ্ঞানের কোনো বিরোধ না হয়। অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষ অন্ধ থাকবেই এবং এই অন্ধকার দূর করবার জন্য সে নিত্য নূতন চেষ্টা করবে। মানসিক আশ্রয় (Instrument) হিসাবে যে-কোনো সামান্যরূপের একান্ত প্রয়োজন আছে এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সামান্যরূপের যোগ্যতা মার্কস্‌-ইজম্‌-এর না থাকবার কোনো কারণ নেই। টাইমস্‌-এর সমালোচকের মার্কস্‌-ইজম্‌-এর প্রতি অনুকম্পা থাকলেও তিনি তার আসল গুরুত্বকে উপলব্ধি করিতে পারেননি। মার্কস্‌-ইজম্‌ বা অন্য কোনো 'ইজম্‌' পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে যদি প্রগতিমূলক কোনো দৃষ্টি দিয়ে সব বিষয় উপলব্ধি করতে হয়, যদি বর্তমানের সমস্ত বিরোধ ও সংস্কারকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলতে হয়, তাহলে মার্কসীয় জীবন ও সমাজ-দর্শন স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ মার্কস্‌ ইজম্‌ই সমস্ত বিরোধকে স্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে অনিরুদ্ধ সংগ্রামের ফলে, সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির বজ্রবাণী ঘোষণা করে। মার্কস্‌-ইজম্‌ই সেই বৈপ্লবিক রাজপথের সন্ধান দেয়, যে-পথে অগ্রসর হয়ে শিল্পী ও মানুষ বাস্তবকে উচ্চতর বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারে, ছোট ছোট অলিগলির গোলকধাঁধার মধ্যে মানুষ যেখানে নৈরাশ্যের অবসাদে আচ্ছন্ন হয় না। সেই প্রশস্ত পথই মানুষের একমাত্র বরেণ্য পথ। সামান্যরূপ বা আধেয়, এদের কোনো স্বতন্ত্র নিষ্ক্রিয় সত্তা নেই। আধেয় থেকে সামান্যরূপের সৃষ্টি এবং সামান্যরূপ ও আধেয় পারস্পরিক

প্রতিক্রিয়াতে সক্রিয় থাকে। সে-মার্কস্-ইজম্ কোনো শিল্পীর বা মানুষের জঁাকাল, শোভনীয় পোশাক হতে পারে না অভিনয়ের চমকপ্রদ আংরাখা নয় মার্কস্-ইজম্। সমগ্র সত্তা ও জীবন দিয়ে শিল্পী মার্কস্-ইজম্ উপলব্ধি করবেন। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ যখন চতুর্দিক থেকে শিল্পীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে, তখন তিনি অবনমিত অন্তঃকরণে পশ্চাৎপদ হবেন না। জীবনের সেই দর্শনকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করবেন, একমাত্র যার অনুপ্রেরণায় বৈরিতাকে ধ্বংস করে অগ্রাভিযান সম্ভব। ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত বিরোধী শক্তি যখন আজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে শিল্পীর বিরুদ্ধে, মানুষের বিরুদ্ধে, যখন ভদ্রবেশী বর্বর পুঁজিবাদী ও ফ্যাশিস্টদের কণ্ঠ থেকে স্পষ্ট উচ্চারিত হচ্ছে,—"I Miles, Expedi Crucem"—তখন শিল্পীর ও মানুষের কণ্ঠ থেকেও সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আসুক

> I am defending my honour...as a revolutionary; I am defending my communist ideology, my ideals, the content and significance of my whole life. (Dimitroff's speech at Leipzig Court—Reichstag Fire Trial).

এই হচ্ছে জীবন্ত মানুষের ভাষা। এখানে মার্কস্-ইজম্ রঙিন্ চিত্ত-বিনোদনকারী কিংখাব নয়, সামান্যরূপ নয়, অন্তর ও বাহির দুয়ের ওতপ্রোত মিলন। এই হচ্ছে মানুষের জয়যাত্রার মহামন্ত্র। সমগ্র সত্তার অণুপরমাণুতে এই মন্ত্র অণুরণিত হয় বলেই তার এই সরল ও সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং মার্কস্-ইজম্ শিল্পীর মনের সামান্যরূপ নয়, মার্কস্-ইজম্ শিল্পীর সমগ্র সত্তার উপলব্ধ সত্য।

মানুষ ও তার সর্পিল ক্রমবিকাশ হচ্ছে মার্কসীয় দর্শনের মর্মকথা। এই মানুষ একদিকে যেমন শিল্পী বা স্রষ্টা তেমনি আরএকদিকে শিল্পের উপাদান। সংগ্রাম-মুখর এই সক্রিয় মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কি? মানুষের ব্যক্তিক স্বাধীনতার স্বরূপ কি এবং সামাজিক সংগ্রামে তার মূল্য কতটুকু? শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে অমূলক ধারণা আছে তা দূর করবার জন্য এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন্। ব্যক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে ফ্রিড্রীশ্ এঙ্গেলস্ বলেছেন

> History makes itself in such a way that the final result always arises from conflicts between many individual wills, which each again has been made what it is by a host of

particular conditions of life. Thus there are innumerable intersecting forces, an infinite series of parallelograms of forces which give rise to one resultant—the historical event. This again may itself be viewed as the product of a power which, taken as a whole, works *unconsciously* and without volition. For what each individual wills is obstructed by everyone else, and *what emerges is something that no one willed.* But from the fact that individual wills . do not attain what they want, but are merged into a collective mean, a common resultant, it must not be concluded that their value=O. On the contrary, *each contributes to the resultant and is to this degree involved in it.*

"ইতিহাসের গতির এমনই ধারা যে শেষ পর্যন্ত যা ঘটে তা বহু ব্যক্তির সঙ্কল্পের সংঘর্ষের ফল, এবং এই সঙ্কল্পের প্রত্যেকটি আবার জীবনের বহু বিশেষ অবস্থার দ্বারা গঠিত হয়। সুতরাং বহু শক্তির প্রতিচ্ছেদ আছে, বহু সামান্তরিক শক্তি আছে, যার ফল হচ্ছে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনা আবার এমন শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে যার ক্রিয়া নির্জ্ঞাত। কারণ প্রত্যেকের সঙ্কল্পকে অন্য সকলে বাধা দেয় এবং যা আবির্ভূত হয় তা সকলেরই সঙ্কল্পাতীত। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তির সঙ্কল্পের পরিণতি সাধারণ ফলে সেহেতু এ-সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে তার মূল্য শূন্য। উপরন্তু সেই সাধারণ ফলাফলে সকলেরই কিছু কিছু দান আছে, এবং ঠিক ততটুকুই সেই সাধারণ-লব্ধের সঙ্গে প্রত্যেকে জড়িত।"

এঙ্গেলস্-এর এই উক্তি শুধু ঐতিহাসিকের দিক থেকে নয়, শিল্পীর দিক থেকেও প্রণিধানযোগ্য, কারণ শিল্পীর ইচ্ছা ও অনুভূতি বাস্তব জীবন-ক্ষেত্রে অন্য মানুষের ইচ্ছা ও অনুভূতির সঙ্গে সংগ্রামরত। এই সংগ্রামের ফলে যা আবির্ভূত হয় তা কেউ ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছা করে না, প্রত্যেকের অবচেতন মনে গোপন থাকে। যা সৃষ্ট হয় তা নূতন—"What emerges is something that no one willed"—এবং জগতের সমস্ত মহৎ শিল্পই তাই। ব্যক্তির মূল্য এখানে শূন্য হয়ে যায় না, সেই নূতনের আবির্ভাবের জন্য তার শক্তির ও ইচ্ছার সংযোগ থেকে ব্যক্তির মূল্য নির্ধারিত হয়।

শিল্পের উদ্দেশ্য জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করে তাকে ব্যক্ত করা। সত্যের

এই অভিব্যক্তি বাস্তবের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়, সংপৃক্ত। সত্য বিমূর্ত, অপরিবর্তনীয় নয়—সত্য মূর্ত, গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। মানুষের সক্রিয় সামাজিক জীবনের সংগ্রামের মধ্যেই এই সত্য যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করে আবার অন্তর্ধান করে। সত্য ধ্রুব নয়, কারণ মানুষ ধ্রুব নয়, তার পরিবেষ্টন ধ্রুব নয়, বাস্তব জীবনও ধ্রুব নয়। শিল্প সত্য, কারণ শিল্পী জীবনের পূজারী, বাস্তবের স্রষ্টা। শিল্প সুন্দর কারণ মানুষ সুন্দর, বাস্তব সুন্দর, জীবন সুন্দর। শিল্প মঙ্গলময় কারণ শিল্পী জীবনের যুগান্তকারী রূপকার, উচ্চতর বাস্তবের ও মহত্তর সত্যের স্রষ্টা। সেইজন্য লেনিন বলেছেন: "Truth is formed out of the totality of all aspects of a phenomenon of reality, and then (mutual) relationships." বাস্তবের সমগ্রতা থেকে সত্যের জন্ম। এই বাস্তব হচ্ছে সামাজিক মানুষের সংগ্রাম-মুখর বিরোধ-আকীর্ণ জীবন। শিল্পী যুগে যুগে সমাজের ও মানবজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বাস্তবের সমগ্র রূপকে উপলব্ধি করে সত্যকে প্রকাশ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কাব্য

কাব্য মানুষের আদিম শিল্প। আদিম যুগে কাব্যের কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না, কারণ তখন মানুষের সমস্ত বোধ ও অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠত কাব্যে। ধর্ম, ইতিহাস, যাদুবিদ্যা, আইন প্রভৃতি সবকিছুর বাহন ছিল কাব্য বা গীত। সে-কাব্য আধুনিক অর্থে কাব্য নয়, তার বৈশিষ্ট্য ছিল আবেগময় ভাষা। শব্দে, ঝঙ্কারে, ছন্দে, অনুপ্রাসে মিলে আদিম ভাষার যে-মোহ, যে-আকর্ষণ ছিল, তাতেই সে নির্বিবাদে কাব্যের আসন দখল করে বসেছিল। সুরই ছিল আদিম ভাষার প্রাণ। বিদ্যুৎপ্রবাহে সে-ভাষা ইন্দ্রিয়স্থানে গিয়ে পৌঁছত। সে-ভাষা ছিল বেশি চিত্তাকর্ষক ও চিত্রাত্মক। প্রাচীন অনবচ্ছিন্ন ভাষার মারফত যে-কোনো ভাব অপরের মনে পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত হত। আদিম ভাষা ও কবিতার মধ্যে এই কারণেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। আদিম মানুষ প্রত্যেকটি শব্দ ব্যবহার করত রূপকভাবে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে যন্ত্র-সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার যে বিবর্তন ঘটেছে তাতে অনেক প্রাচীন শব্দা-লঙ্কারের সরসতা ও সৌন্দর্য গিয়েছে নষ্ট হয়ে। জীবনযাত্রার প্রণালী যখন ক্রমেই জটিল হতে লাগল, ভাষার সেই আদিম সরসতা ও স্ফূর্তি লোপ পেয়ে ক্রমে জন্ম হল গদ্যের। গান ও গীতিকবিতার যখন জন্ম হয়েছিল তখন গদ্যের জন্ম হয়নি। মানুষের শিল্পের বা নন্দনশাস্ত্রের আলোচনাতে সেইজন্যই কাব্য সর্বপ্রথম বিচারের দাবি করে।

> … …Warbling rose
> Man's voice in verse before he spoke in prose.
> (Oehlenschlager)

বিষাদময় কর্মপ্রবণতাকে কেন্দ্র করে ভাষা গড়ে ওঠেনি, স্ফূর্তি ও বালসুলভ প্রফুল্লতার মাঝখানে ভাষার জন্ম হয়েছিল। যে-সব হৃদয়াবেগের আঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হত তার মধ্যে প্রেমের স্থান ছিল সকলের উঁচুতে। আদিম কথাবার্তার ভিতর দিয়ে শুনতে পাওয়া যেত বালকবালিকা, যুবক-

যুবতীর আনন্দের কোলাহল, যখন প্রেমিকের একজোড়া প্রশংসাতুর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তারা প্রাণ খুলে গাইত ও নাচত। জেস্‌পার্সন্ বলেন

> Language was born in the courting days of mankind ; the first utterances of speech I fancy to myself like something between the nightly love-lyrics of puss upon the tiles and the melodious love songs of the nightingale. (Language)

কিন্তু একমাত্র প্রেমই আদিম সঙ্গীতের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল না। যে-কোনো প্রীতিকর উত্তেজনা, অনুভূতি বা শঙ্কা সঙ্গীতের ছন্দে মূর্ত হয়ে উঠত। অসভ্য বুনোরা একটু উত্তেজিত হলেই গান করত, ভূমিকম্পের সময়, শিকারের সময়, বিহারের সময়,—মুখেমুখেই তারা এই সব গান রচনা করত। নদীর বুকে নৌকায় দাঁড় বাইবার সময় নীগ্রোরা হয় কোনো প্রণয়কাহিনী, না হয় কোনো সুন্দরী নারীর রূপ বর্ণনা করত গান গাইতে গাইতে। পূর্ব-আফ্রিকার বাসিন্দারা কতকগুলি এলোমেলো অর্থহীন শব্দ একসঙ্গে সুর করে আবৃত্তি করত ক্লান্তি না আসা পর্যন্ত। কার্ল বুশার (Karl Bucher) বলেন জগতের সমস্ত জাতির দৈনন্দিন জীবনের কার্য-কলাপের একমাত্র সহায়ক হচ্ছে এই ছন্দোবদ্ধ গান (Arbiet und Rhythmus)। আদিম যুগে যেখানে মহাকাব্যের কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় না সেখানে গীতিকবিতার চিহ্ন একটু-আধটু মেলে। বোয়াস্ বলেন

> Even where the slightest vestiges of epic poetry are missing, lyric poetry of one form or another is always present. It may consist of the musical use of meaningless syllables that sustain the song ; or it may consist largely of such syllables, with a few interspersed words suggesting certain ideas and feelings ; or it may rise to the expression of emotions connected with war-like deeds, with religious feeling, love or even to the praise of the beauties of nature. (International Journal Amer. Ling. 1.8)

যেখানে মহাকাব্যের কোনো চিহ্নও নেই, সেখানে গীতিকবিতার কিছু চিহ্ন মিলতে পারে। এই গীতিকবিতা অর্থহীন সঙ্গীতধর্মী শব্দবিন্যাস হতে পারে ; অথবা এই শব্দঝঙ্কারের মধ্যে এমন কয়েকটি শব্দ ছড়িয়ে

থাকতে পারে যার দ্বারা কোনো বিশেষ ভাব বা অনুভূতি ব্যক্ত হতে পারে; কিংবা যুদ্ধ, ধর্ম, প্রেম ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনো ভাবাবেগের বিকাশও হতে পারে।

গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোদের যাদুমন্ত্রের মধ্যে, থ্যাল্‌বিত্‌জার (W. Thalbitzer) বলেন, এমন অনেক শব্দ উচ্চারিত হত যা কখনো বাইরে কথাবার্তার মাঝখানে ব্যবহৃত হত না। মাওরি ও আফ্রিকার নিগ্রোদের ধর্মমন্ত্রের মধ্যেও এইরকম পাওয়া যায়। জেস্‌পার্সন্‌ "The Oath of the Canting Crew" থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন

No dimber, dambler, angler, dancer
Prig of cackler, prig of pancer ;
No swigman, swaddler, clapper-dudgeon,
Cadge-gloak, curtal, or curmudgeon ;
······(Farmer's Muse Pedestris).

প্রাচীন যুগের এই সঙ্গীতধর্মী ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক যুগের কয়েকজন পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে জেম্‌স্‌ জয়স্‌, মার্শেল প্রুস্ত ও মিস্‌ গার্টরুড স্টাইন্‌-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা ভাষাকে ভেঙেচুরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর গড়বার চেষ্টা করছেন। জয়স্‌ ও স্টাইন্‌-এর ভাষা আদিম ভাষার মতো সঙ্গীতধর্মী। শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যেমন

Nuvoletta in her lightdress, spunn of sixteen shimmers were looking down on them, leaning over the bannistars and listening all she childishly could......She tossed her sfumas-telliacinous hair like la Princesse de la Petite Bretagne, and she rounded her mignons arms like Mrs. Cornowallis West and she smiled over herself like the beauty of the image of the post of the daughter of the queen of the Emperor of Irelande ......(James Joyce).

Sweet sweet sweet sweet sweet tea.
Susie Asado.
Sweet sweet sweet sweet sweet tea.
Susie Asado.

Susie Asado which is a told tray sure.
A lean on the shoe this means slips slips hers.
(Gertrude Stein)

সুভোলেটার রূপ ও চরিত্রের দোষগুণ জয়স্ ফটিয়েছেন শুধু তরঙ্গায়িত শব্দের ভিতর দিয়ে। পাখীর মতো নৃত্যগীতমুখরা একটি মেয়ের চরিত্র সুসি এসাডোর মধ্যে ফুটে উঠেছে শুধু শব্দের ঝঙ্কারে। সুসির সরলতা. গৃহকর্মে অখণ্ড নিষ্ঠা, তীব্র তরল কণ্ঠস্বর, সযত্ন অবহেলা ও অপরিচ্ছন্নতায় আনন্দ—সব শুধু শব্দের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আদিম ভাষার অর্থহীনতা ও ও সুরঝঙ্কারের প্রতি এই আকর্ষণের মূলে রয়েছে বর্তমানের বিরোধক্লিষ্ট, সংগ্রাম-মুখর জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা, প্রত্যাবর্তনের মনোভাব। এইসব শিল্পীর অবচেতন মনের অভিপ্রায় সেইজন্য এই অধুনালুপ্ত আদিম ভাষার সাবলীলতায় পরিতৃপ্তি খোঁজে।

কবিতার বিশেষ গুণ হচ্ছে সঙ্গীত। সঙ্গীতের ছন্দের মধ্যে সংঘআবেগ (Collective Emotion) প্রকাশের অবকাশ আছে প্রচুর। আদিম কাব্য তাই সঙ্গীতধর্মী। কিন্তু আদিম মানুষের এই সংঘ আবেগের প্রয়োজন ছিল কেন? বাঘের, শত্রুর, ভূমিকম্পের বা বৃষ্টির ভয় দূর করবার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া তো মানুষের সহজাত স্বভাব। সকলেরই বিপন্ন হবার সম্ভাবনা যেখানে, সকলেই একত্রে সেখানে সাড়া দেবে। এ-ক্ষেত্রে এই সংঘ-ভাব জাগ্রত করবার জন্য বাইরের কোনো উপায় অবলম্বনের আবশ্যকতা কি? অর্থাৎ নৃত্য বা উৎসবের মধ্যে গান গেয়ে সেই মনোভাব জাগরণের প্রয়োজন তখনই হয়, বিশেষ করে সমাজের দিক থেকে, যখন বাইরে কিছু দৃশ্যমান না থাকলেও ভবিষ্যতে ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। এখনই হয়তো বাঘ আক্রমণ করেনি বা অতিবৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে বাঘ আক্রমণ করতে পারে, শুধু অতিবৃষ্টি হতে পারে। এ নিছক কল্পনা নয়, এই আশঙ্কার পিছনে রয়েছে অতীতের অভিজ্ঞতা। সুতরাং দৃশ্যত বাইরে না ঘটলেও, ভবিষ্যতে ঘটবার সম্ভাবনা থাকার দরুন এমন কোনো উপায়ের সাহায্য প্রয়োজন হয় যার দ্বারা মধ্যে মধ্যে এই সংঘ-ভাব সকলের মনে জাগ্রত করা যেতে পারে। সুতরাং সঙ্গীতের আবশ্যকতা। এইভাবে জীবিকা ও নিরাপত্তার প্রয়োজন থেকে হল কবিতার জন্ম, এবং বাস্তব (Reality) থেকে হল অবাস্তবের (Illusion) সৃষ্টি।

আদিম মানুষকে তার অজৈব অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য শিকার-লাভ বা ফসল-উৎপাদনের জন্য ঘন ঘন পরিশ্রম করতে হত। শুধু সহজাত-প্রবৃত্তির

তাড়নায় এই উদ্দেশ্য-সাধন সম্ভব হত না। সেই সহজাত-প্রবৃত্তি কোনো সামাজিক উপায়ে ফসলের চাহিদা মেটানোর জন্য নিয়োজিত হত। এই সামাজিক উপায়ের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল সংঘ-উৎসব (Group Festival), যেখানে সকলের পুঞ্জীভূত হৃদয়াবেগ মুক্ত হয়ে পরিচালিত হত ঐক্যবদ্ধ সুনির্দিষ্ট পথে। আদিম কাব্যের জন্ম এই সংঘ-উৎসবে। আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ফসলের অস্তিত্ব তখন হয়তো নেই। তখন সেই ফসল থাকে কল্পনায় এবং কাল্পনিক ফসল উৎসব-মত্ত মানুষের দৃষ্টিপথে বিরাজ করে। নৃত্যের উন্মত্ততায়, সঙ্গীতের সুরাবর্তে ও কবিতার ছন্দে প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে আদিম মানুষ নিজেকে ছিন্ন করে অভিক্ষেপ করত এই কাল্পনিক জগতে, যেখানে তাদের চোখের সামনে অসংখ্য ফসল মৃদু বাতাসে হেলত দুলত। তখন সেই কাল্পনিক জগৎ সঙ্গীতের উন্মাদনায় মনে হত বাস্তবতর জগৎ। উৎসব শেষে সে-জগৎ মিলিয়ে যেত না। ফসলের সেই কাল্পনিক জগৎকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য আদিম মানুষ সঙ্গীতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রে মহানন্দে পরিশ্রম করত।

কিন্তু কি উপায়ে এই সংঘ-ভাব সজাগ হত? যে-সব শব্দ (Words) দৈনন্দিন কর্মজীবনে প্রত্যেক মানুষের ভাবানুষঙ্গ (Emotional Association) অধিকার করেছে তারাই ক্রমশ সংগৃহীত হয়ে ছন্দের ভিতর দিয়ে সঙ্গীতে মূর্ত হয়ে উঠত।

'গিজাড় তে গিজ্‌দে' বাদ্যের শব্দ, তার সঙ্গে 'ক্ষেত', 'ধান' ও 'হাল' ফসলের ইঙ্গিত জানায়। এই কয়টি শব্দকে ছন্দোবদ্ধ করে গেঁথে সকলেরই মনে ফসলের ভাব উদ্রেক করবার জন্য গাওয়া যেতে পারে। জাগরণের মুহূর্ত থেকে কর্মে অনুপ্রাণিত হবার সময়ের মধ্যে এই ভাব অন্তর্ধান করত না। প্রত্যেক মানুষ গোষ্ঠী-জীবনের (Tribal Life) সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজে পরিবর্তিত হত। এই পরিবর্তনের মাহেন্দ্রক্ষণ ছিল উৎসব ও পরিবর্তক ছিল সঙ্গীত।

আদিম শিল্প এইভাবে সংঘ-আবেগ (Collective Emotion) সৃষ্টি করে তাকে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের পথে চালনা করত। এর ফলে শ্রমের অবসাদ অনেক লঘু হত এবং শ্রমে আনন্দ পেত মানুষ। সমবেত হয়ে সকলে জমি চষত, শস্য বপন করত। এই সম্মিলিত শ্রমের

সঞ্চালনী শক্তি ছিল সংঘ-আবেগ এবং এই সংঘ-আবেগের জনয়িতা ছিল সঙ্গীত বা আদিম কাব্য।

সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই হৃদয়াবেগ পরিবর্তিত হল। আদিম খাদ্যসংগ্রহকারী, শিকারী মানুষ প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে অভিক্ষেপ করত তার বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার জন্য। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখবার জন্য তার নিজের সামাজিক রূপ পরিবর্তিত হত। সেইজন্য আদিম শিল্প ছিল প্রাকৃতিক ও প্রত্যক্ষ (Perceptive)। যেমন পুরোপলীয় মানুষের (Palaeolithic man) চিত্রাঙ্কন এবং অস্ট্রেলিয়ান্ অসভ্যদের পাখি বা পশু অনুকরণে নৃত্য ও সঙ্গীত। টোটেম্ (Totem) ছিল উপলক্ষ, মানুষ ছিল প্রকৃতি। তারপর আরএক স্তর ঊর্ধ্বে এল শস্য-উৎপাদনকারী ও পশুপালনকারী মানুষ। প্রকৃতিকে গ্রহণ করে তাকে পরিবর্তন করবার চেষ্টা করা হল নিজেদের ইচ্ছা পূরণের জন্য। সেইজন্য এদের শিল্প হল ইচ্ছাপ্রসূত। যেমন নবোপলীয় মানুষের (Neolithic) খেয়ালী ছবির শোভা এবং আফ্রিকান্ ও পোলিনেসীয়ান্ গোষ্ঠীর ধর্মোৎসব। এর উপলক্ষ হল শস্য-দেবতা ও পশু-দেবতা এবং প্রকৃতি হল মানুষ। তারপর এইভাবে গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃতিকে বরণ করবার ফলে শ্রমবিভাগের (Division of Labour) সূচনা হল এবং ক্রমে ক্রমে প্রভুর, পুরোহিতের ও শাসকশ্রেণীর আবির্ভাব হল। শিল্প তখন প্রভুর স্তুতিগান করত এবং দেবতারও গুণকীর্তন করত। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে বিভেদ ও একতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ক্রমে নিজের আভ্যন্তরীণ বিরোধ সম্বন্ধে সচেতন হল, কারণ এই সচেতনতার পরিবেষ্টন তখন বিদ্যমান।

এইভাবে সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানুষ পরিবেষ্টনের সঙ্গে সংগ্রাম করে কাব্যকে সমৃদ্ধ করল। অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদনের অস্ত্র যেমন ক্রমে উন্নীত হল, তেমনি কাব্যও অজৈব প্রেরণা থেকে উন্নততর উপায়ে রূপায়িত হল। উৎপাদনের অস্ত্র মানুষের হাতেই নূতন কার্যে নিযুক্ত হল। হাতের আকৃতির পরিবর্তন হল না বটে কিন্তু অস্ত্রের ব্যবহার বদলে গেল। তেমনি কাব্য মানুষের অন্তরে নূতন অনুভূতি সৃষ্টি করে তাকে রূপ দিতে প্রয়াস পেল, কিন্তু হৃদয়ের ধর্ম যে আকাঙ্ক্ষা তার কোনো পরিবর্তন হল না। আদিম মানুষের সঙ্গে এ-যুগের

মানুষের যদি কোনো আন্তরিক ঐক্য থাকে তাহলে সে হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের সহজবৃত্তির সঙ্গে অর্থাৎ মানুষের চিরাকাঙ্ক্ষামুখর, বাসনাস্পন্দিত হৃদয়ের সঙ্গে। সমাজের ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে অনুভূতি বদলায়, বাসনা নূতন বাসনায় রূপ নেয়, কিন্তু মানুষের অন্তরের দুর্বার কামনাস্রোত কখনো শুকিয়ে যায় না, তা চিরপ্রবহমাণ, গতিশীল। ক্রমোন্নতিতে যুগে যুগে তার বিকাশ। আদিম কাব্যের মতো যুগে যুগে মানুষ কাব্যের প্রেরণায় এক কাল্পনিক জগতে অভিক্ষিপ্ত হয়, কারণ এই কাল্পনিক জগৎ হচ্ছে তাৎকালিক বাস্তব জগৎ অপেক্ষা বাস্তবতর—এই বাস্তবতর জগৎ তখনো প্রত্যক্ষ জীবন্ত বাস্তবে পরিণত হয়নি, এবং সেই পরিণতির জন্য কাব্য কল্পনায় তাকে অভিনন্দন জানায়। এখানে ভুল বোঝবার হয়তো অবকাশ আছে, কিন্তু ভুল কিছু নেই। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে কাব্য তাহলে এমন কিছু রূপায়িত করবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। তা নয়। খামারভরা ধান বা ফসলের প্রাচুর্য সম্বন্ধে কাল্পনিক উৎসব না করলে মানুষ সেই ফসল উৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করবে না। সঙ্গীতের মত্ততা তার ক্লান্তি দূর করবে। এক সঙ্গে সঙ্গীতের ছন্দে কোদাল চালিয়ে, কাস্তে নেড়ে, লাঙল চষে, সে ফসল বুনবে। ফসলের চাহিদা তার রয়েছে, ফসল উৎপাদনের উপযুক্ত পরিবেষ্টনও রয়েছে, প্রয়োজন প্রেরণার। এই প্রেরণা কাব্য যোগায় উন্নততর বাস্তবের মধ্যে অভিক্ষেপ করে। এই উন্নততর বাস্তবে অভিক্ষিপ্ত (projected) মানুষ তখন কাব্যের উন্মাদনায় তাকে প্রত্যক্ষ বাস্তবে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করে নিজের শ্রম দ্বারা। অন্ধ সহজ-প্রবৃত্তি থেকে এই রূপান্তর ঘটে না, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সক্রিয় চেষ্টার ভিতর দিয়ে এই রূপান্তর ঘটে। কাব্যের উপাদানের প্রত্যক্ষ অস্তিত্বই কাব্যের সত্য (truth) নয়, কাব্যের গতিশীলতা ও সংঘ-আবেগই (Collective Emotion) কাব্যের সত্য।

> Not poetry's abstract statement—its content of facts, but its dynamic role in society—its content of collective emotion, is therefore poetry's *truth*. (Christopher Caudwell—Illusion & Reality)

ভাবের গভীরতায় নিমজ্জিত হবার অবসর যাদের ছিল না সেই আদিম মানুষের মনকে ঘন ঘন অনুপ্রাসের সশব্দ আঘাতে, সঙ্গীতের সুরে, উত্তেজিত

ও অনুপ্রাণিত করা হত। মাঠে যখন ফসল নেই, আকাশে যখন মেঘ নেই, তখন ফসলের চারিধারে নৃত্য করে, গান গেয়ে, মাঠভরা ফসলের এক কাল্পনিক জগতে মানুষ বিক্ষিপ্ত হত, একসঙ্গে ব্যাঙের ডাক ডেকে, মেঘের গর্জন অনুকরণ করে এক কাল্পনিক ঘনবর্ষার পরিবেষ্টন সৃষ্টি করা হত। সেই ছন্দের ও সুরের প্রেরণায় মানুষ মাঠে যেত একসঙ্গে, কাল্পনিক জগৎকে বাস্তবে রূপ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সে-কল্পনা তখন হত তার কাছে প্রত্যক্ষ বাস্তব অপেক্ষাও বাস্তবতর, সেইজন্য তাকে রূপায়িত করবার জন্য শ্রম করতে সে অবসন্ন হত না। ক্রমে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ফলে ও উন্নততর সমাজব্যবস্থার ফলে, মানুষ কর্মময় জীবনে কাব্যের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে, অবসর জীবন বিনোদনের জন্য কাব্যকে গ্রহণ করেছে। কারণ শ্রমবিভাগের (Division of Labour) ফলে সমাজ যে শ্রেণীবিন্যস্ত রূপ ধারণ করেছে, সেখানে শাসকশ্রেণীর শাসনব্যবস্থা এক শ্রেণীকে প্রচুর অবসর দান করে আরএক শ্রেণীকে দিয়েছে শ্রমের পরিবর্তে জীবনধারণের অধিকার। শ্রেণীহীন সমাজ ভিন্ন (Classless Society) কাব্যের মধ্যে সেই সংঘ-আবেগ মূর্ত হয়ে মানুষকে কর্মপ্রবণ করতে পারবে না। এ-যুগের কাব্যের তাই মঙ্গলবাণী নেই, গতি নেই, স্ফূর্তি নেই। যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে সেই নিজে হয়েছে যান্ত্রিক, যন্ত্রের মধ্যে বিরাট শক্তির পরিচয় সে পায়নি। সে মুক্ত শক্তির আস্বাদে তার বিমুখতা, বিতৃষ্ণা। এ-যুগের কাব্যে কোথায় সেই কল্পনা ভ.িষ্যতের সেই উন্নততর বাস্তব, সেই গতিশীলতা, সেই সংঘ-হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তি? অথচ এ-যুগের কাব্যের সৌন্দর্যের ও পূর্ণতার উপাদান প্রচুর।

পঞ্চম অধ্যায়

কাব্যের ক্রমবিকাশ

আদিম শিকারীর ও খাদ্যসংগ্রহকারীর চিৎকারে হল কবিতার জন্ম, মানুষ যখন নিজেকে পরিবর্তন করে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে চাইল। প্রকৃতির মধ্যে মানুষ নিজেকে নিক্ষেপ করত সচেতন হয়ে, কারণ যা সামাজিক তা সচেতন হবেই। সকলে একসঙ্গে মিলিত না হলে শিকার করা বা খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। এই আদিম যুগে মানুষের অন্তর থেকে তাই উৎসারিত হত প্রকৃতির অনুকৃতি (Mimicry)।

তারপর মানুষ নিজেকে ছেড়ে প্রকৃতিকে নিজের উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী করে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করল। পশুপালন, ফসল উৎপাদন প্রভৃতি আরম্ভ হল। সমাজের রূপ অবশ্য তখনো বিশেষ বিভেদ-ম্লান হল না, সংঘ-সৌন্দর্য বজায় রইল। সে যুগের কাব্য তাই রূপ গ্রহণ করল প্রার্থনায়, স্তবস্তোত্রে, মিলিত সংঘ-সঙ্গীতে।

প্রকৃতি সমাজের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়ে সমাজে করল বিভেদ সৃষ্টি, ক্রমে দুটি পরস্পর-বিরোধী অংশে সমাজ গেল বিভক্ত হয়ে। শ্রম-বিভাগের ফলে হল সমাজ বিভেদ। গ্রাম্য ও কৃষি সভ্যতার ফলে একদল হল শাসক-শ্রেণী, আর একদল হল গোলাম-শ্রেণী। প্রকৃতি-বনাম মানুষের সংগ্রাম পরিবর্তিত হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে। ধর্মসঙ্গীত রূপান্তরিত হল মহাকাব্যে ও গল্পে এবং নূতন কাব্যের উপাদান হল ন্যায় অন্যায়, আনন্দ ও প্রেম। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ এই সর্বপ্রথম নিজেকে ব্যক্ত করল কাব্যের মধ্য দিয়ে এবং গীতিকবিতার জন্ম হল।

ধনতান্ত্রিক সমাজ হল তার পরের পর্যায়, বুর্জোয়াশ্রেণী হল শাসকশ্রেণী। ধনতন্ত্রের ক্রমোন্নয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর পরিবর্তন, পরিবেষ্টনের বৈপ্লবিক প্রগতি ও কাব্যের ক্রমবিকাশ বিশেষভাবে প্রণিধেয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রারম্ভে হল প্রাথমিক সঞ্চয়ের (Primitive Accumulation) কাল, মোটামুটি ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময় বুর্জোয়াশ্রেণীর শক্তি সঞ্চয়ের সময়, কারণ রাষ্ট্র তখনো বুর্জোয়া-রাষ্ট্র হয়নি, বা বুর্জোয়াশ্রেণী এমন রাজনৈতিক প্রতিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি, যার মধ্যে

আত্মপ্রকাশ পরিপূর্ণভাবে সম্ভব। সুতরাং এই সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা-জনিত বিশৃঙ্খলা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই সময় প্রত্যেক বুর্জোয়ার মনের মধ্যে এই ভাবই জাগ্রত রইল যেন তার স্বাধীনতাকে চারিদিক থেকে নিয়মকানুন দ্বারা শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছে, এবং জীবনের সৌন্দর্য ও স্বাধীনতা একমাত্র আত্মাকাঙ্ক্ষার উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ দ্বারাই লভ্য। তাই এই কালের মনোভাব হল বিদ্রোহী। ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অন্য সব ইচ্ছাকে অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বেহিসেবী হল, এবং তার বহিঃপ্রকাশ হল আত্ম-দৃঢ়তা ও আত্ম-সবলতার মধ্যে। এলিজাবেথীয় যুগের জীবন-ধর্ম হল বিপ্লবী, কারণ সামন্ততন্ত্রের কাঠামোকে ধূলিসাৎ করে ধনতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হলে প্রয়োজন স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের মতো শক্তির প্রয়োগ। সেইজন্য এলিজাবেথীয় কাব্যের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল রাজকীয় আত্ম-সংকল্প, বলিষ্ঠ বুর্জোয়ার আত্ম-প্রতিজ্ঞা, এবং তার লক্ষ্য ছিল যাবতীয় প্রচলিত বিধিনিষেধকে বিলীন করে নিজের জয়বার্তা ঘোষণা করা।

মার্লো, চ্যাপমান্, গ্রীন, বিশেষ করে সেক্সপীয়র এই প্রাথমিক ধনতান্ত্রিক যুগের আত্মম্ভরি মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। লিয়র, হ্যামলেট্, ম্যাকবেথ্, এণ্টনি, ট্রয়লাস্, ওথেলো রোমিও, কোরিওলেনাস্—সেক্সপীয়রের নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে শুধু একটি সুরই ঝঙ্কৃত হয়, এবং সে-সুর হচ্ছে নায়কের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার অদম্য সঙ্কল্প। বদান্যতার যুগকে নূতন বুর্জোয়াশ্রেণী সসম্মানে বিদায় দিয়েছে, সে-গুণের আজ আর কোনো আকর্ষণ নেই, তাই ফলস্টাফ্ ও আর্মাডো প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা। সেক্সপীয়র তাঁর সমসাময়িক সমাজকে যে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর ট্র্যাজেডি রচনার উৎকর্ষতা থেকে। করুণা ও ভয় সংমিশ্রিত মনোভাব জাগ্রত করা ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য, শুধু তাই নয়, ট্র্যাজেডি "effects a *Katharsis* of them", এবং সেক্সপীয়রের শিল্প-মাহাত্ম্য হচ্ছে এই ট্র্যাজেডি রচনার সাফল্যের মধ্যে। আরিস্ততল্ (Aristotle) "*Katharsis*" শব্দ বিশুদ্ধীকরণ (Purification) অর্থে ব্যবহার করেননি। সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত দিয়ে আরিস্ততল্ বলেছেন যে কোনো উদ্দীপক সঙ্গীতের গুণ হচ্ছে উদ্দীপ্ত মানুষকে প্রশান্তি ও আনন্দ দান করা—"By the administration of like emotion···excessive emotion is purged away, and the process is accompanied by feelings of pleasure." মনের মধ্যে সমভাব উদ্রিক্ত হয়ে অতিরিক্ত ভাব

নিষ্কাশিত হয় এবং আনন্দানুভূতি জাগে। মিল্টন্ তাঁর 'Samson Agonistes'-এর ভূমিকায় আরিস্ততল্-এর Katharsis-এর এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে লিখেছেন যে ট্র্যাজেডির লক্ষ্য হচ্ছে "...to be of power by raising pity and fear, or terror, to purge the mind of those and such like passions, that is to temper and reduce them to just measure with a kind of delight, stirred up by reading or seeing those passions well imitated." ট্র্যাজেডিয়ান্ হিসাবে সেক্সপীয়রের মহত্ত্ব ও সাফল্য এইখানে। তৎকালের বুর্জোয়াশ্রেণীর অহংসর্বস্বতা, আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য প্রচেষ্টা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে যাবতীয় বাধাবিপত্তির প্রতি তাচ্ছিল্যভাব—এইসব সেক্সপীয়রের নায়কদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোথাও এই 'অহম্' বহির্জগতের সঙ্গে বিভক্ত হয়ে সংগ্রামরত, যেমন হ্যামলেটে; কোথাও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে এই 'অহম্'-এর প্রতিষ্ঠা, যেমন ম্যাকবেথে; কোথাও প্রেমের সাহজিক ধর্ম পালনে, যেমন "রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট্" ও "অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রায়"। নিজের ইচ্ছার ও সঙ্কল্পের উপর নিজের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়কত্বই প্রত্যেকটি চরিত্রের করুণান্ত পরিণতির কারণ, অর্থাৎ ট্র্যাজিক, এবং তৎকালের বুর্জোয়াশ্রেণীর মনে এই সমভাব উদ্রেক করে, *Katharsis*-এর ফলে আনন্দ দান করতে হলে ট্র্যাজেডির সাহায্য ব্যতিরেকে উপায় ছিল না। সেক্সপীয়র মহৎ শিল্পী ছিলেন এবং সমসাময়িক সমাজের অন্তরে প্রবেশ করবার মতো তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল। সেক্সপীয়র সেইজন্যই ট্র্যাজেডিয়ান্ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠতাও ট্র্যাজেডির মধ্যে।

সেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্রগুলির আরএকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের কর্মমুখরতা ও গতিশীলতা। প্রত্যেকটি চরিত্র 'নায়ক' (Hero) নামের যোগ্য। তাদের জীবন ঐতিহাসিক জীবন, সত্য ও প্রাণবন্ত জীবন। জীবনের স্পন্দন প্রত্যেকটি চরিত্রের সংগ্রাম, বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ভিতরে অনুভূত হয়। নিঃসন্দিগ্ধ ওথেলো পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভেনেশীয়ান্ সেনেটরের কন্যা ডেস্‌ডেমোনাকে বিবাহ করল। কিন্তু ক্যাসিওর লেফ্‌টন্যাণ্ট পদের ঈর্ষায় জর্জরিত আয়াগোর বৈরিতাকে জয় করতে না পেরে ওথেলো প্রিয়তমা ডেস্‌ডেমোনাকে সন্দেহ করে হত্যা করল এবং নিজের ধ্বংসকে নিজেই আহ্বান করল। ওথেলোর চরিত্র এখানে জীবন্ত, পরিবেষ্টন-সাপেক্ষ। মায়ের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিহিংসা-তাড়িত হ্যামলেট্ নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নবিচ্ছিন্ন

হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ধ্বংস করল। কোর্ডেলিয়াকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে উদভ্রান্ত লীয়র ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাত্রির মধ্য দিয়ে পরিশেষে কারাগারে মৃত্যুকে বরণ করল। ব্রিটেনের লুপ্ত ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্য পুনরুদ্ধার করবার দায়িত্ব রইল জোনারিলের স্বামী এলবানির উপর। রাজসিংহাসনকামী ম্যাকবেথ্ সত্যই যখন শুনল যে প্রেতাদের কথামতো বির্নাম বন এগিয়ে আসছে, তখনো সে শত্রুর কাছে নিজেকে দান করেনি। ম্যাক্‌ডাফের সুমুখে যখন ম্যাকবেথ্ শুনল যে সে "untimely ripped from his mother" তখনো সে হতাশ হয়ে জানু নত করেনি, ঘোরতর সংগ্রাম করে মৃত্যুকে বরণ করেছে। এইভাবে সেক্সপীয়রের নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে বাধাবন্ধনহীন ব্যক্তিত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে, এবং সে-প্রকাশ উচ্ছৃঙ্খল নয়, পরিবেষ্টনের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়াশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল। তাদের কার্যকলাপ, তাদের ধ্বংস, মৃত্যু, সবকিছুই সেইজন্য করুণ মনে হয়, গরিমা কোথায় যেন তারই মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। হেজ্‌লিট্ সেক্সপীয়র-সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে চসারের (Chaucer) চরিত্রের তুলনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলেছেন

Chaucer's characters are sufficiently distinct from one another, but they are too little varied in themselves, too much like identical propositions. They are consistent, but uniform ; we get no idea of them from first to last ; *they are not placed in different lights, nor are their subordinate traits brought out in new situations* ; *they are like portraits or physiognomical studies*, with the distinguishing features marked with inconceivable truth and precision, but that preserve the same unaltered air and attitude. Shakespeare's are historical figures, equally true and correct, *but put into action*, where every nerve and muscle is displayed in the struggle with others, with all the effect of collision and contrast, with every variety of light and shade............ In Chaucer we perceive a *fixed essence* of character. In Shakespeare there is a *continual composition and decomposition of its elements*, a fermentation of every particle in the whole mass, by its alternate affinity or antipathy to other principles which are brought into contact with it. Till the experiment is tried we do not know the result,

the turn which the character will take in its new circumstances.

(Italics লেখকের)

(William Hazlitt—The Characters of Shakespeare)

"চসারের চরিত্রগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও কোনো বৈচিত্র্য নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের সম্বন্ধে কোনো ধারণা গড়ে ওঠে না। বিভিন্ন কোণ থেকে তাদের উপর আলোকসম্পাত করা হয় না, ফলে তারা বহুবর্ণ-রঞ্জিত একটি সমগ্র চিত্র না হয়ে প্রতিকৃতি হয়। সেক্সপীয়রের চরিত্রগুলি ক্রিয়াশীল, তাদের প্রত্যেকটি শিরা ও পেশী পরস্পর-সংগ্রামরত, বিচিত্র আলোছায়ার মধ্যে তাদের প্রকাশ। চসারের চরিত্রের একটি নির্দিষ্ট গুণ আছে, কিন্তু সেক্সপীয়রের চরিত্রের প্রত্যেকটি উপকরণের অবিরাম সংযুতি ও বিয়োজনের ফলে আমরা পরীক্ষা না শেষ হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারি না কোন চরিত্র কোন অবস্থায় কি রূপ গ্রহণ করবে।"

নূতন সমাজের শিল্পীদের আজ বুর্জোয়া সমাজের শিল্প-সম্রাট্ সেক্সপীয়রের এই দৃষ্টি দিয়ে চরিত্রকে উপলব্ধি করতে হবে। বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের বিকৃতরূপ প্রকাশ করে কোনো সার্থকতা নেই, বাস্তবের মধ্যে পরিপূর্ণ মানুষকে রূপায়িত করতে হবে। আজ ধ্বংসোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজে যাঁরা নূতন যুগের পূর্বাচলের দিকে চেয়ে আছেন সেই সব শিল্পীদের চরিত্রসৃষ্টির কৌশল শিখতে হবে অতীতের নবীন জীবন্ত বুর্জোয়া সমাজের সেক্সপীয়র প্রমুখ শিল্পীদের কাছ থেকে। সত্যকার বিপ্লবী যিনি তিনি প্রাচীনকে কখনো অবজ্ঞা করেন না, সেখান থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেন ভবিষ্যতের জন্য, কারণ এ-যুগে যা প্রাচীন তা সে-যুগে নবীনের সম্ভাবনাতেই সমুজ্জ্বল ছিল।

এই প্রাথমিক সঞ্চয়ের কাল কেটে গিয়ে এল বুর্জোয়া সমাজের পরিবর্তনের যুগ। বুর্জোয়াশ্রেণী এখন স্বতন্ত্র উৎপাদক-শ্রেণী এবং রাজার যে একাধিপত্য একদিন তার প্রাণশক্তির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল, আজ আর তা হল না। আজ রাজা হল বুর্জোয়া-বিরোধী। কোর্ট এখন অন্যায়ের কেন্দ্রস্থল, জীবনের পূতিগন্ধ সেখান থেকেই নির্গত হয়। মানুষের দুরভিসন্ধি ও ক্লিন্নাচার সেখানে মোলায়েম আইনের পোশাক পরিয়ে ঢেকে রাখা হয়। ডোনে (Donne), ক্রশ (Crashaw), হেরিক (Herrick),

হার্বার্ট প্রমুখ সে-কালের কবিদের কাব্যও সেইজন্য নিভৃত কোণের সলজ্জ অথচ গর্বিত মনের অভিব্যক্তি।

এই পরিবর্তনের কাল ক্রমে বিপ্লবে রূপ নিল। পার্লামেণ্ট ও স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সে-যুগ হল সশস্ত্র বিদ্রোহ ও অন্তর্বিপ্লবের যুগ, এবং সে-যুগে ইংলণ্ডের প্রথম বিদ্রোহী কবি হলেন মিল্টন (Milton)। মিল্টনের ভাব ও রচনারীতি উভয়ই হল বিপ্লবী। বুর্জোয়া শিল্পীর এই সচেতন বৈপ্লবিক মনোভাব মিল্টনের "Paradise Lost"-এ সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। মিল্টনের স্টাইলও সেইজন্য মহান্ ও তেজস্বী হলেও সচেতন, এবং সচেতন বলেই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। শয়তানের কণ্ঠ থেকে যে-বাণী উৎসারিত হয়েছে সে হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতাকামী সচেতন বুর্জোয়াশ্রেণীর বাণী, বিপ্লবী শিল্পীর মর্মোৎসারিত শৃঙ্খল-মুক্তির বাণী।

...Hail horrors, hail
Infernal world, and thou profoundest Hell,
Receive thy new possessor : one who brings
A mind not to be chang'd by place or time,
The mind is its own place, and in itself
Can make a Heav'n of Hell, a Hell of Heav'n.
What matter where, if I be still the same,
And what I should be, all but less than he
Whom thunder hath made greater ? Here at least
We shall be free ; th' Almighty hath not built
Here for his envy, will not drive us hence :
Here we may reign secure, and in my choice
To reign is worth ambition, though in Hell :
Better to reign in Hell, than serve in Heaven.

(*Paradise Lost : Book I*)

তারপর এল কৃষি-ধনতন্ত্রের (Agricultural Capitalism) যুগ। কারখানা নয়, ভূমি তখনো প্রধান অবলম্বন। বুর্জোয়াশ্রেণী ঠিক স্বাবলম্বী হতে পারেনি। মূলধন রয়েছে, কিন্তু তেমনভাবে শ্রমজীবীশ্রেণী নেই। শ্রমজীবীদের সংখ্যা অল্প। কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকেরা ঠিক তখনো শ্রমজীবীর স্তরে পৌঁছয়নি। শ্রমজীবীর সংখ্যা কম হওয়াতে বুর্জোয়াশ্রেণী ভাবল যে

শ্রমের মূল্য বাড়তে পারে, সেইজন্য প্রয়োজন হল আইনকানুনের সাহায্য নিয়ে শ্রম ও শ্রমমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইভাবে বুর্জোয়াশ্রেণী ভূমির মালিকদের ছায়াতলে নিজেদের মুক্তির পথ সুগম করতে আরম্ভ করল। ধনতন্ত্র তখনো বহির্মুখী হয়নি, অর্থাৎ পুরোপুরি প্রাথমিক রক্ষণের (conservation) স্তর অতিক্রম করে তখনো ধনতন্ত্র এমন সীমায় পৌছয়নি যখন "it cannot exist without constantly revolutionising the means of production". ঠিক এই সময়েই কবি পোপ্-এর (Pope) আবির্ভাব এবং পোপ্-এর কাব্যে মানুষ্যব্যবচারের যুগে "bourgeoisified aristocracy"-র সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর সন্ধির আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। পোপ্-এর কাব্যেও সেইজন্য ঠিক কাব্যরস নেই, প্রাথমিক বুর্জোয়াশিল্পীদের সেই স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী অন্তরের উদ্বেল নেই, শুধু নীরস যুক্তি, সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও প্রভুগোষ্ঠীর চাটুতা আছে।

পোপ্ সম্বন্ধে হেজ্‌লিট্ অতি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন

His Muse was on a peace-establishment, and grew somewhat effeminate by long ease and indulgence. He lived in the smiles of fortune, and basked in the favour of the great. In his smooth and polished verse we meet with no prodigies of nature, but with *miracles of wit* ; the thunders of his pen are *whispered flatteries* ; its forked lightnings *pointed sarcasms* ; for the gnarled oak, he gives us the soft myrtle : for rocks and seas, and mountains, artificial grass-plants, gravel walks, and tinkling rills ; for earthquakes and tempests, the breaking of a flower-pot, or the fall of a china jar ; for the tug and war of the elements, or the deadly strife of the passions, we have 'Calm contemplation and poetic ease'."

—William Hazlitt : Lectures on the English Poets

এর পরে এল শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution), অর্থাৎ ধনতন্ত্রের বিস্ফোরণ-কাল। বৈজ্ঞানিক প্রগতি সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করে ধনতন্ত্রের প্রসারে সহায়তা করল। এই মেদস্ফীত ধনতন্ত্রকে একটি দেশের চতুঃসীমানার মধ্যে বন্দী রাখা সম্ভব হল না, পৃথিবীব্যাপী সে ছড়িয়ে পড়ল শ্বাস-প্রশ্বাসের স্ফূর্তির জন্য। ভূমির মালিকেরা এই নূতন বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। যন্ত্র ও বাইরের সাম্রাজ্যের কাঁচামাল মূলধনকে যে প্রচুর

প্রসারশক্তি দিয়েছে, ভূমির আভিজাত্য তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে কেন? প্রতিযোগিতার ফলে যন্ত্র তার দাস্ শ্রমজীবীশ্রেণীকে সৃষ্টি করেছে, সুতরাং শ্রমমূল্য সম্বন্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর দুশ্চিন্তার বা পরমুখাপেক্ষিতার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন সমস্ত বাধাবিপত্তিকে ধূলিসাৎ করে ধনতন্ত্রের অবাধ জয়যাত্রার শঙ্খধ্বনি করা। বুর্জোয়াশ্রেণী পুনরায় তাই নিজেরই সৃষ্ট ভ্রমের চারিদিকে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করল: মানুষের সাম্য, মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের স্বাভাবিক মহত্ত্ব পুনরায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণার প্রয়োজন হল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্বন্ধকে বিকৃত করল অর্থের আদানপ্রদান, হিসাবনিকাশ। মানুষিক সম্বন্ধ হল 'callous cash-nexus', প্রত্যক্ষ প্রীতির সম্বন্ধ দূর হয়ে গেল। ভারতবর্ষ বুর্জোয়াসভ্যতার সে-স্তর না অতিক্রম করলেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর থেকে এই ভাবই সুস্পষ্ট উৎসারিত হয়েছে। এই কালের ইংলণ্ডের কবিদের মনোভাব রবীন্দ্রনাথের ভাষা প্রয়োগ করে ব্যক্ত করা যায়:

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি,
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

(বর্ষশেষ)

কীটস্ কি তাঁর 'Ode to Nightingle'-এর মধ্যে এই একই অভিযোগ জানাননি? তাঁর Darkling-কে সম্বোধন করে তিনি কি বলেননি "To thy high requiem become a sod"— যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

শ্যেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও পঙ্ককুণ্ড হ'তে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী করে' দাও মোরে বজ্রের আলোতে"—

এইসময়ে ইংলণ্ডের কাব্যে একদিকে যেমন মানবতার, স্বাধীনতার ও সাম্যের কাল্পনিক সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে, শৃঙ্খলিত মনের বৈপ্লবিক কামনা ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি আরএকদিকে অনুরণিত হয়েছে 'পঙ্ককুণ্ড' থেকে পরিত্রাণের ইচ্ছা, নৈরাশ্যের বিলাপ। ওয়ার্ডস্বার্থ্ (Wordsworth),

বাইরন (Byron), শেলী (Shelley), কীটস্ (Keats) প্রমুখ কবিরা একদিন যে-সুরে গান গেয়েছিলেন, আজও ঠিক সেই সুর তীব্রতর হয়ে ধ্বনিত হচ্ছে, একদিকে ষ্টিফেন স্পেণ্ডর (Stephen Spender), ডে ল্যুইস্ (Day Lewis) ও আর একদিকে এলিয়ট্ (T. S. Eliot), অডেন (W. H. Auden), পাউণ্ড (Ezra Pound) প্রমুখ কবিদের মধ্যে। প্রভেদ শুধু সুরের গ্রামের, মূল সুরের নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পোপ্ ও প্রাক্তন ফরাসী স্কুলের কবিদের প্রভাবে ইংরেজি কাব্য প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল। তখন এই জড়তা দূর করবার জন্য প্রয়োজন ছিল কোনো উত্তেজক প্রেরণার, এবং এই প্রেরণা যুগিয়েছিল ফরাসী বিপ্লব-কালীন প্রতিবেশ। এই সময়কার ইংলণ্ডের কবিদের বলা হয় লেক স্কুল, এবং ওয়ার্ডস্বার্থ্ একরকম নেতা ছিলেন এই স্কুলের।

> This school of poetry had its origin in the French revolution, or rather in those sentiments and opinions which produced that revolution; and which sentiments and opinions were indirectly imported into this country in translations……From the impulse it thus received, it rose at once from the most servile imitation and tamest commonplace, to the utmost pitch of singularity and paradox…The change in the belles-lettres was as complete, and to many persons as startling, as the change in politics, with which it went hand in hand. There was a mighty ferment in the heads of statesmen and poets, kings and people.
>
> —W. Hazlitt : Lectures on the English Poets.

ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর কাব্যপ্রতিভা এই যুগেই প্রস্ফুটিত হয়। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সে ছিলেন এবং সেই সময় কয়েকজন ফরাসী বিপ্লবী নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সামাজিক অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওয়ার্ডস্বার্থ্ বিদ্রোহ করেন, এবং যা কিছু সাধারণ, মানুষ থেকে গাছ, ফুল, পাখী পর্যন্ত সব, তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব যখন "Terror"-এ পরিণত হয় তখন ওয়ার্ডস্বার্থ্ সামাজিক সংস্কারেও বিশ্বাস হারান এবং বিমূর্ত সমাজ ও মানুষের চিন্তায়

মগ্ন হন। "Incidents on Salisbury Plain"-এর প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরোধিতা থেকে তিনি "The Borderers" ট্র্যাজেডির মধ্যে তাঁর নৈরাশ্যকে প্রকাশ করেন। এই ট্র্যাজেডি রচনাকালে তিনি ভ্রাম্যমাণ জীবন শেষ করে শান্তিতে ডোরসেট্‌শায়ারে তাঁর ভগ্নী ডরোথির সঙ্গে দিন যাপন করছিলেন। ডরোথির "vehemence of affection" ও প্রকৃতি-প্রিয়তা ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর দৃষ্টি ও অন্তরকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে, কৃষকের, রাখালের সরল জীবনযাত্রার দিকে। তিনি প্যাস্টোরাল কবিতা রচনা শুরু করলেন। তারপর রেসডাউন থেকে আল্‌ফকস্‌ডেনে গিয়ে কোল্‌রিজ-এর সান্নিধ্যে তিনি কাব্য রচনায় যথেষ্ট উৎসাহিত হন। কোল্‌রিজ-এর তুরীয়ভাব (Transcendentalism), বার্ক্‌লের আদর্শবাদ, স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ প্রভৃতির নিত্য আলোচনা ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি মানসিক শক্তি ও মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরে পান। এই সময় ওয়ার্ডস্বার্থ্ "Recluse", কোল্‌রিজ-এর ভাষায় "the first great philosophical poem in existence", রচনা করেন। "The Prelude", "The Excursion", "Lyrical Ballads" প্রভৃতি এই সময়েই রচিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও তার দৃষ্টি এড়াত না এবং তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল গ্রামে ও তার আশেপাশে বিক্ষিপ্ত। কোল্‌রিজ গেয়েছেন "The Ancient Mariner", ওয়ার্ডস্বার্থ্ রচনা করেছেন "Goody Blake" ও "Simon Lee"-র গাথা। ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর ব্যালাডগুলিকে কোল্‌রিজ "Corporeal", "Matter-of-fact" বলে দুঃখ করেছেন, এবং তাঁর দুঃখের কারণও আছে। ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর সারল্য তখন কাব্যিক গণ্ডি ছাড়িয়ে এতদূর বিজ্ঞানের গণ্ডিতে গিয়ে পড়েছিল যে তিনি নিজেই সে সময় কবিতাকে "The history and science of the feelings" বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর কাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল শুধু সরল ও তরল আনন্দোচ্ছ্বাস—"He never wrote with such glee"—প্রকৃতি ও মানুষ ছিল তাঁর আনন্দের উৎস। প্রিয় বন্ধু ও অনুরক্তা ভগ্নীর সান্নিধ্যে তিনি সে-সময় আরো বেশি প্রেরণা পেয়েছিলেন, যার জন্য "He could afford to suffer with those he saw suffer" এবং "he was bold to look on painful things"—আনন্দই তাঁর কবিতার একমাত্র গুণ ছিল এবং কবিকে তিনি বলতেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুখী। সেজন্যই বলেছেন

Had he died then, in his thirty-sixth year, having lived as long as Byron and much longer than Shelley or Keats, he would have left a fame almost as high as he was to attain, though of a different character. His freshness of thought and style being taken together, his works would have stamped him as one of the most daring among the poets of his day. The sedate and sometimes conventional moralising which has been associated with his name comes into existence in his later productions.

—E. Legouis on William Wordsworth in the *Cambridge History of English Literature* Vol. XI

১৮০৫ সালের পর থেকে ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর জীবনে ও কাব্যে পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তনের কারণ ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দুই-ই। নেপোলিয়নের রাজ্যলাভের পর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার গ্লানিময় পরিণতিতে তিনি বিশ্বাস করলেন, সামাজিক বিপ্লবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা হারালেন। বহির্জগতের এই অবনমিত পরিবেষ্টন এবং স্ত্রী মেরী হাচিনসন্-এর ধীর স্বভাব, পুত্রকন্যার মৃত্যু প্রভৃতি নানা ব্যাপারে ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর ভিতরের স্ফুলিঙ্গ নিভে গেল। ডরোথির সেই আবেগময় স্নেহ নেই, কোল্‌রিজ-এর সেই গভীর শ্রদ্ধা ও ঘনিষ্ঠতা নেই। তাই একদিন কোল্‌রিজ-এর "Dejection" কবিতার প্রত্যুত্তরে তিনি যে আশাবাদী "Leech-Gatherer" রচনা করেছিলেন, তার পরিবর্তে সেদিন অভিনন্দন জানালেন কঠোর কর্তব্যকে, দেবতার 'নিষ্ঠুর কন্যাকে' এবং বললেন "Thee I now would serve more strictly, if I may,"—তাঁর সৌন্দর্যবোধ, আনন্দ, প্রেম সমস্তই "কর্তব্যের" কাছে মাথা হেঁট করল

Flowers laugh before thee on their beds,
And fragrance in thy footing treads;
Thou dost preserve the Stars from wrong,
And the most ancient Heavens through thee are fresh
and strong.

শেষে আত্মার অবিনশ্বরতায়, দেবতার স্বর্গরাজ্যে ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর কাব্য সমাধিস্থ হল। একদিন পৃথিবীর যে-শ্যামলতা, মানুষের ও প্রকৃতির যে স্বাভাবিক সারল্য ও সৌন্দর্য, জীবনের স্বচ্ছ আনন্দ ও প্রেম, যৌবন তাঁর

সামনে খুলে ধরেছিল, আজ তার অবসান হয়েছে এবং তাঁর ভাবধারা ও কাব্যের এই বিকাশের জন্য দায়ী রাজনৈতিক পরিবেষ্টন ও ব্যক্তিগত কারণ দুই-ই।

The evolution of his ideas, which made his old age diametrically opposed to his youth, can be traced, step by step, accounted for by outward circumstances and earnest meditations ... it is a progress from poetry to prose, from bold imaginings to timorousness, from hope to mistrust, from life to death. (Ibid Vol. XI. Chap. V)

ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর এই যুগকে দুভাগে ভাগ করা যায়,—ওয়ার্ডস্বার্থ্, কোল্‌রিজ ও স্কট্ (১৭৯৮-১৮০০) এবং শেলী, কীট্‌স্ ও বাইরন (১৮১৬-১৮২০)। হারফোর্ড (C. H. Herford) বলেছেন

Politically, the earlier group were bitter opponents of the Revolution; Wordsworth and Coleridge were even 'renegades'. The later group were all Liberals; in Byron and Shelley the spirit of the Revolution first entered poetry. The liberty which Wordsworth adored was from the first rather the condition in which men observe morality without outer interference, than that in which they follow the bent of passion without restraint; and both he and Coleridge, after their bitter disillusion, learned to look on political laws, as such, with the idealising sympathy of Burk. But with Shelley and Byron, liberty is a vehement and politically *anarchical outpouring of individuality* into action; an ideal more egoistic in Byron, in Shelley more spiritual and humane. The counterpart in poetry of this political individualism was *the self-assertion of the artist.* (C. H. Herford : The Age of Wordsworth.)

রাজনীতির দিক থেকে ওয়ার্ডস্বার্থ্ ও কোল্‌রিজ ছিলেন বিপ্লব-বিরোধী, এবং বায়রন ও শেলী উদার কবি, তাঁদের কাব্যে বিপ্লবের স্বর ঝঙ্কৃত হয়েছিল। ওয়ার্ডস্বার্থ্-এর স্বাধীনতা ছিল মানুষের নৈতিক জীবনের প্রহরী, মানুষের অন্তরের অদম্য আবেগ নয়। রাজনৈতিক নিয়মের প্রতি ওয়ার্ডস্বার্থ্ ও কোল্‌রিজ-এর সেইজন্য বার্ক্-এর মতো আদর্শবাদী সহানুভূতি ছিল।

কিন্তু বায়রন ও শেলীর কাছে স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে ক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিত্বের দুর্দমনীয় প্রকাশ। এই প্রকাশ বায়রন-এর কাছে ছিল একান্ত ব্যক্তিক, শেলীর কাছে ছিল মানুষিক। কাব্যে এই ব্যক্তিবাদ মূর্ত হয়ে ওঠে কবির আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে।

অভিজাতশ্রেণীর শক্তিক্ষয় সম্বন্ধে সচেতন হয়েও বায়রন তাঁর অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা বর্জন করতে পারেননি। সেইজন্য বায়রন-ইজম্-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্লেষ ও ভাবপ্রবণতা। অভিজাত সমাজকে তিনি নির্মমভাবে বিদ্রূপ করেছেন, তাঁর "Don Juan"-এর মধ্যে তার সাক্ষ্য রয়েছে, কিন্তু বুর্জোয়া-সমাজের স্বাধীনতাকে তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর সমাজ-বিদ্রোহ তাই শৃঙ্খলিত মনের আস্ফালন মাত্র, শরতের মেঘের মতো শুধু গর্জে গর্জে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, বর্ষণ সম্ভব হয়নি। এই বিদ্রূপ ও আকাশস্পর্শী আত্মগরিমার স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে নৈরাশ্য ও মৃত্যুচিন্তা, —"The Island" ও "Age of Bronze"-এর মধ্যে তার পরিচয় রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল দাম্ভিক মন মৃত্যুর কাছে আয়ু ভিক্ষা চাইল। বায়রন লিখলেন

If thou regretest thy life—why live ?
The land of honourable death
Is here—up to the field and give
Away thy breath.

শেলীর মনের প্রসার ছিল বায়রন-এর চেয়ে শতগুণ বেশি, তাই ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। আঠারো বৎসরের শেলীর "Queen Mab"-এর সুর তাই পরে উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত হয়েছে "Prometheus Unbound", "Epipsychidion", "Ode to West Wind" ও "Triumph of Life"-এর মধ্যে। গতিশীল, পূর্ণস্বাধীনতাকামী বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের আদর্শ অনুরণিত হয়েছে শেলীর কাব্যে, সেইজন্য শেলীর কাব্যের বিশেষ গুণ হচ্ছে গতিশীলতা। বায়রন-এর উচ্ছ্বাস বুদ্‌বুদের মতো বিলীন হয়ে যায়, যে অন্তরনির্ঝর তার উৎস সেখানেই আবর্ত সৃষ্টি করে, ফুঁপিয়ে ফেনিয়ে সে অন্তর্ধান করে। শেলীর কাব্য প্রচণ্ড অন্তরাবেগের মূর্তবাণী, যে-বাণী অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে অযুতধারায় বিশাল মানবসমুদ্রে মিলিত হয়। স্বাধীনতার চিন্তায় আত্মহারা বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের

স্বার্থের সঙ্গে শ্রেণী-নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থকে অভিন্ন ভাবতে কুণ্ঠিত হয়নি। শেলী ঠিক তাঁর যুগের এই মনোভাবের আদর্শ প্রতীক ছিলেন, সেইজন্য তাঁর কাব্যে যে-স্ফূর্তি, যে-স্পন্দন, যে-আবেগ, যে-অতিক্রমনীয়তা দেখতে পাওয়া যায় তা অন্যের কাব্যে পাওয়া যায় না। Indian Serenade-এ শেলী বলছেন

Oh lift me from the grass !
I die ! I faint ! I fail !

"Ode to West Wind-এ বলছেন

Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud !
I fall upon the thorns of life ! I bleed !

Epipsychidion-এ বলছেন

Woe is me !
The winged words on which my soul would pierce
Into the height of Love's rare universe,
Are chains of lead around its flight of fire—
I pant, I sink, I tremble, I expire !

—কিন্তু এ-সব হচ্ছে শেলীর ব্যক্তিগত বিলাপ। নিজের দুঃখের পরিবর্তে যখন শেলী মানুষের দুঃখের, মানুষের পরাধীনতার সঙ্গীত রচনা করেন, তখন ক্লান্ত, ক্লিষ্ট শেলীর কণ্ঠে ভবিষ্যতের ভেরীর শব্দ ধ্বনিত হয়

Scatter, as from an unextinguished hearth
Ashes, and sparks, my words among mankind !
Be through my lips to unawakened earth
The trumpet of a prophecy ! (*Ode to West Wind*)

—এবং নিপীড়িত মানবতাকে আহ্বান করে বলেন

Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number—
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you—
Ye are many—they are few. (*The Mask of Anarchy*)

বায়রন "a portion of the storm" হতে চেয়েছিলেন তার "fierce and far delight"-এর জন্য, হারফোর্ড-এর ভাষায় "to be the comrade of its ruinous splendour", কিন্তু শেলী সে-উদ্দেশ্যে ঝড়ের সহযাত্রী

হতে চাননি। ঝড়ের যে ভয়াল রুদ্রমূর্তি, তার ধ্বংসের যে তাণ্ডবলীলা, তারই কম্‌রেড হওয়া ছিল বায়রন-এর অভিলাষ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শেলী "West Wind"-কে সম্বোধন করে বলেননি

যেখানে নিক্ষেপ কর হৃতপত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত-তমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ।

—শেলী চ্যুত পত্রের মতো পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছিলেন নূতন জীবন সৃষ্টির জন্য—"to quicken a new birth"—ক্ষণিক খেলনার মতো নির্মম ঝটিকা-দস্যুর লুণ্ঠনাবশেষের সঙ্গে কোনো বিস্মৃতির দেশে বিলীন হয়ে যাবার জন্য আবেদন করেননি। তাই যে-দস্যু শীতের হৃতপত্র ও ছিন্নভিন্ন শাখা নিয়ে দৌরাত্ম্য করে তাকে আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন

…O, Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind?

পেটি-বুর্জোয়া, সংগ্রাম-ক্লিষ্ট কীটস্‌-এর কাছে বুর্জোয়া সমাজ অন্যরূপে প্রতিভাত হল। প্রকৃতির বুকে যখন তিনি আশ্রয় চাইতেন, তখনো পৃথিবীর দুঃখকষ্ট বেদনাকে তিনি ভুলতে পারতেন না। কাব্যের অলস পাখায় ভর দিয়ে কীটস্‌ এ-পৃথিবীর বেদনাম্লান পরিবেষ্টন ছেড়ে নিজের সৃষ্ট এক অলৌকিক মায়াময় রূপকথার দেশে যাত্রা করতেন। Endymion-এর জন্য Moon-এর গড়া, প্রিয়ের জন্য Lamia-র গড়া সে-পৃথিবী, নাইটইংগেল্‌ যেখানে মুক্তকণ্ঠে—"with full-throated ease"—গান করে, সেখানেই কীটস্‌ চলে যেতে চান, সুরা পান করে যদি না হয়, ব্যাকাসের সঙ্গী হয়ে যদি না হয়, তা হলে কাব্যের সোনালি পাখায় ভর দিয়ে, কারণ এই বাস্তব পৃথিবী দুর্বিষহ, জঘন্য। কিন্তু তবু কীটস্‌ যে হতভাগ্য এবং এ-পৃথিবীকে তিনি ছাড়তে চাইলেও বাস্তব যে তাঁকে বারবার ডেকে ফিরিয়ে আনে, সে-সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। নাইটইংগেলের মধুর সঙ্গীতে তাঁর যে-তন্দ্রা এসেছিল, তন্দ্রার ঘোরে তিনি যে রঙিন স্বপ্নের দেশে বিচরণ করছিলেন, শুধু 'forlorn' কথাই তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনল এ-জগতে, আবার জীবনের দুঃখ, যন্ত্রণা, গ্লানি, সব কিছুর পীড়াদায়ক স্মৃতি তাঁর

মনের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসল, তিনি বললেন, "Do I wake, or sleep ?"

বুর্জোয়াশ্রেণী প্রত্যেক পদে পদে তার স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবীর জন্য আরো জটিলতর প্রতিযোগিতা, সামাজিক ভেদ ও পরাধীনতা সৃষ্টি করে। এই ভ্রমের অনুগামী হয়ে সে নিজের ভিত্তিকে ক্রমেই শিথিল করতে থাকে, এবং শ্রেণীর দিক থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে, নূতন উৎপাদন-শক্তির সৃষ্টি করে, শ্রমজীবীশ্রেণীর চেতনা ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে, প্রতিযোগিতার ফলে শ্রেণীভুক্তদেরও উচ্ছেদ শুরু হয়। প্রচলিত সামাজিক সম্বন্ধ ধ্বংস হলে মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও শ্রেষ্ঠতা বিকশিত হয়ে উঠবে, বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর এই যে বিশ্বাস এরই প্রতিচ্ছায়া হচ্ছে আদর্শবাদ। কাব্যে এই আদর্শবাদ বিভিন্নরূপে ওয়ার্ডস্বার্থ্, বাইরন, শেলী ও কীটস্-এর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, সমাজের শ্রেণীরূপ এঁদের কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি, এবং সেইজন্যই এঁরা নিজেদের সৃষ্ট ভ্রমের পিছনে ঘুরেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রীতি ও ভাবের দিক থেকে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনও এনেছিলেন।

কীটস্, বাইরন প্রভৃতির মধ্যে যে নৈরাশ্যের আভাস পাওয়া গিয়েছিল, পরে টেনিসন্ (Tennyson), ব্রাউনিং (Browning), সুইনবার্ন, আর্নল্ড্ প্রমুখ কবিদের কাব্যে সে-মনোভাব আরো তীব্রতর হয়ে অভিব্যক্ত হয়। টেনিসন্-এর "In Memoriam" নৈরাশ্যের ও ব্যর্থতার চূড়ান্ত নিদর্শন। এই নৈরাশ্যের স্তর অতিক্রম করে বুর্জোয়া কাব্য "art for art's sake"-এর স্তরে পৌছয়। বুর্জোয়া অর্থনীতির পণ্য-রতি (commodity-fetishism) কাব্যে "আর্টের খাতিরে আর্ট"-এ রূপ গ্রহণ করে। এঙ্গেলস্ বলেছেন

> Anarchy reigns in social production. But commodity production, like all other forms of production, has its own laws, which are inherent and inseparable from it ; and these laws assert themselves in spite of anarchy, in and through anarchy,···they assert themselves, therefore, apart from the producers and against the producers, as the natural laws of their form of production, working blindly. *The product dominates the producers.*" (Engels : *Anti-Duhring*)

আদিম যুগে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য যখন নির্ধারিত হত সামাজিক

প্রয়োজনের দিক থেকে, তখন কাব্যেরও উৎকর্ষতা যাচাই করা হত গোষ্ঠী-জীবনের উপর তার প্রভাব কতখানি তাই দিয়ে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন করা হয় উদ্দেশ্যহীনভাবে মার্কেটের জন্য, যে-মার্কেটের নিয়মকানুন উৎপাদকের অজানা। সামাজিক জীবনের উপর পণ্যের প্রভাব বিচার করা অসম্ভব, এবং এই অবস্থায় একান্ত সহায়হীন হওয়া ভিন্ন মানুষের উপায় নেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রে "The product dominates the producer"—কাব্যের ক্ষেত্রে "Art dominates the artist"—অর্থাৎ বাস্তব জগৎ থেকে কাব্যজগৎ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেল। শিল্প হবে শিল্পের খাতিরে, সমাজ বা মানুষের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

বুর্জোয়া অর্থনীতির দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও অন্য দেশে Sur-realism-এ পৌঁছল, কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর মন্থরগতির জন্য ইংলণ্ড ঠিক একই ছন্দে অগ্রসর হতে পারেনি। পুঁজিপতিদের মূলধন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে নূতন জীবন পেল, এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি অংশ কিছুকাল বুর্জোয়াশ্রেণীর আওতায় পালিত হয়ে সোনালি স্বপ্নে মশ্‌গুল হয়ে রইল। জর্জিয়ান্ কবিদের মঞ্জুল ছন্দের শিঞ্জন এই স্বপ্নাবেশের পরিচায়ক। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর বুর্জোয়াশ্রেণীর এই বসন্তকাল কেটে গেল, এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট তার কদর্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি কাব্যও প্রতীকের দিকে, Sur-realism-এর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু সুর-রিয়্যালিস্টদের হয় প্রত্যাবর্তন করতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিজম্-এর শিবিরে, আর তা না হলে এগিয়ে যেতে হবে বিপ্লবী শ্রমজীবীশ্রেণীর সঙ্গে। মাঝপথে থমকে থাকবার উপায় নেই। ইংরেজি কাব্য সম্প্রতি সুর-রিয়্যালিস্ট নৈরাজ্যের দিকে না ফিরে, সমস্ত উদারনৈতিক শ্রেণীর সঙ্গে একত্রে শ্রমজীবীশ্রেণীর নেতৃত্বে বিশাল গণফ্রন্টের (People's Front) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে অডেন (W. H. Auden), ডে ল্যুইস্ (C. Day Lewis), স্টিফেন স্পেণ্ডর (Stephen Spender) প্রভৃতির কাব্যে এই বৈপ্লবিক প্রগতির নির্দেশ পাওয়া যায়। ফ্রান্সে জিদ্ (Andre Gide), রোলাঁ (Romain Rolland), আরাগোঁ (Aragon) প্রভৃতির মধ্যে এই বৈপ্লবিক গতি আরো সুস্পষ্ট।

শ্রমজীবীশ্রেণীর প্রতি বুর্জোয়া শিল্পীর তিনরকমের সম্বন্ধ স্থাপিত

হতে পারে। তিনি শ্রমজীবীশ্রেণীর বিরোধী হতে পারেন, তার সঙ্গে সন্ধি করতে পারেন, বা একাত্মাও ভাবতে পারেন। বিরোধী হবার পথ একমাত্র প্রাচীনের দিকে উন্মুক্ত, কিন্তু সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে উপায় নেই, যার ফলে স্পেংলারিয়ান্ শিল্প সৃষ্টিই সম্ভব।* বুর্জোয়া শিল্পী সন্ধি করতে পারেন, যেমন ফ্রান্সে জিদ্, রোলাঁ এবং ইংলণ্ডে স্পেণ্ডর, ডে ল্যুইস্ প্রভৃতি শিল্পীরা করেছেন। বুর্জোয়াশ্রেণী কোনো উচ্চতর সমাজ গড়তে পারেন না, একমাত্র ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্রই তাঁরা গড়তে পারেন। শ্রমজীবীশ্রেণী ভিন্ন বৃহত্তর ও উচ্চতর সমাজ গঠনের ক্ষমতা আর কারো নেই। বুর্জোয়া শিল্পী বিপ্লবী হয়ে শ্রমজীবীশ্রেণীর সঙ্গে যোগদান করতে পারেন। কিন্তু বিপ্লবী বুর্জোয়া শিল্পীরা সহযাত্রী হতে চান, শ্রমজীবীশ্রেণীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংপৃক্ত হতে চান না। বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের প্রতি তাঁদের শুধু ধ্বংসমূলক মনোভাবই জাগতে পারে, কোনকিছু গঠনমূলক তাঁরা ভাবতে পারেন না। উদ্দীপ্ত ভাষায় বিপ্লবের জয়গান তাঁরা গাইবেন কারণ বিপ্লবের প্রলয়ঙ্কর রূপ কল্পনা করতেও তাঁদের ভাল লাগে। কিন্তু তা হলেও এই বিপ্লবী বুর্জোয়া শিল্পীদের ভূমিকা মিথ্যা নয়, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁদের ধ্বংসের গানই শেষ গান, সমাজের জঠরস্থ যে-বিপ্লবের কাল্পনিক রূপের মোহে তাঁরা আত্মহারা, তারই ভূমিসাৎ হবার এই হচ্ছে প্রশস্ত ও শেষ সময়। সেইজন্য শ্রমজীবীশ্রেণী সর্বান্তঃকরণে আজ তাঁদের অভিনন্দন জানাবে। শ্রমজীবীশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ এই বুর্জোয়া শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁদের কাব্যে বা সাহিত্যে যে সত্যকার সাম্যবাদী সমাজের বাস্তব রূপ ফুটে উঠবে তাও সম্ভব নয়। তোতাপাখীর মতো সাম্যবাদের 'বুলি' হয়তো তাঁরা আবৃত্তি করবেন, সত্যকার কাব্যরসের কিছু অভাবও তাঁদের ঘটতে পারে, কিন্তু তাতে আমরা আক্ষেপ করব না। কারণ এ-দ্বন্দ্ব তাঁদের থাকবেই, এ-ত্রুটিও ঘটবে, যতদিন না তাঁরা সহানুভূতির গণ্ডি পার হয়ে সাম্যবাদী সমাজের বাস্তবরূপ সম্বন্ধে সচেতন হন। এ-সচেতনতা একমাত্র বিপ্লবের পর সংগ্রামের মধ্যেই লভ্য। এখন এই বুর্জোয়া শিল্পীরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করে তাঁদেরই শ্রেণী-ভাইদের শ্রমজীবীশ্রেণীর সঙ্গে সন্ধির জন্য আহ্বান করুন। বিপ্লবের এই

*"সংস্কৃতি সঙ্কটের রূপ" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য

কাল্পনিক সঙ্গীতের সার্থকতা আছে। আদিম কাব্যের প্রেরণায় মানুষ যেমন দল বেঁধে মাঠে যেত, কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য, আজও তেমনি কাব্যের সেই প্রেরণা মানুষের মনে সঞ্চারিত হবে বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য। আদিমের এই আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আজকে বিপ্লবী কবিরা ভবিষ্যতের প্রশস্ত পথে জয়যাত্রা করুন। শ্রমজীবীশ্রেণী তাঁদের যোগ্য অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠিত হবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপন্যাস

শব্দের নানাপ্রকার ধ্বনির জন্য দাঁতে (Dante) 'buttered' ও 'shaggy' বলতেন শব্দকে। শব্দ শুধু কোনো বস্তুর প্রতীক নয়, তার ধ্বনি আছে এবং বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। এজ্‌রা পাউণ্ড (Ezra Pound) বলেছেন

> The changing of Language is done in three ways: you receive the language as your race has left it, the words having meanings that have 'grown into the race's skin'; the Germans say 'wie in den schnabel gewachsen,' as it grows in his beak. And the good writer chooses his words for their 'meaning', but that meaning is not a set cut-off thing like the move of a knight or pawn on a chess board. It comes up with roots, with associations, with how and where the word is familiarly used, where it has been used brilliantly or memorably... ... (Ezra Pound : A.B.C. of Reading)

প্রেমিকার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো কবি বলবেন 'সোনার বরণ', কেউ বলবেন 'চাঁপার বরণ'। কবির ইচ্ছা তাঁর প্রেমিকার রূপ পাঠক উপলব্ধি করে মনে মনে প্রশংসা করুক। যখন তিনি 'সোনার বরণ' বা 'চাঁপার বরণ' বলে সে-রূপ ব্যক্ত করবেন তখন পাঠকের বুঝতে কষ্ট হবে না, কারণ চাঁপা ফুলের রং বা সোনার রং-এর সঙ্গে পরিচয় সকলেরই আছে। সুতরাং প্রেমিকার রূপানুভূতিকে ব্যক্ত করবার জন্য কবিকে এখানে এমন শব্দের আশ্রয় নিতে হয়েছে যে-শব্দ বাইরের জগতের কোনো বস্তুর আধার-স্বরূপ, অর্থাৎ অন্য সকলের সেই শব্দের আনুষঙ্গিক ভাব বা বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। কবি যদি শুধু প্রেমিকার রূপ বর্ণনাতে একান্তভাবে ব্যক্তিগত আনন্দ চান, তা হলে তিনি খুশিমতো যে কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু 'দেখেছিলাম ময়না পাড়ার মাঠে, কালো মেয়ের

কালো হরিণ চোখ' বললে ময়না পাড়ার মাঠে গিয়ে কালো মেয়েটিকে দেখবার প্রয়োজন হয় না, কারণ হরিণের চোখের সৌন্দর্য সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কবি এমন শব্দ ব্যবহার করেন যা অন্যের কাছে অপরিচিত নয়, এবং শব্দ কোনো ভাব বা বস্তুর প্রতীক বলে সে-ভাব বা সে-বস্তু সাধারণেরও অভিজ্ঞতার সীমানার বাইরে নয়। কবি নিজে যা অনুভব করেন তাই ব্যক্ত করেন, সুতরাং কবির অনুভূতিরও বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর অনুভূতির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকবে, কারণ তা না হলে অভিব্যক্তিও সর্বসাধারণের বোধগম্য হবে না। এইভাবে মানবতার সাহজিক সাধারণত্বে পৌছান হচ্ছে কবির ও কাব্যের লক্ষ্য। এইভাবে কবি অভিযোজিত (adapted) মানুষের অন্তরালবর্তী আপেক্ষিক গণরূপী মানুষের (Genotype) কাছে আবেদন করেন। কাব্যকে সেইজন্য অন্তর্মুখী বলা হয়। কাব্যে 'আমি'র চারিদিকে মানুষের ভাবাভিজ্ঞতা এসে ভিড় করে। কাব্য কোনো একটি বিশেষ কোণ থেকে সংগৃহীত বাস্তবের কতকগুলি সাহজিক পরিপ্রেক্ষিত-সমষ্টি (Instinctive Perspectives) এবং কাব্য দ্ব্যর্থক বলেই তার প্রসারগুণ তরঙ্গের মতো।

উপন্যাসের প্রাথমিক যাত্রারম্ভ বাস্তব জগৎ থেকে। বাস্তব জগৎই উপন্যাসের বিষয়ীভূত অনুভাবের (Subjective Associations) উৎস। সেইজন্য উপন্যাসে বা আখ্যায়িকার মধ্যে আমরা আমি-র সন্ধান পাই না, উপন্যাসের সৃষ্ট জগতের মধ্যে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করি, কচিৎ নায়কের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম ভেবে তারই সঙ্গে তার প্রতিবেশের "অপরত্ব"-এর (Otherness) চারিদিকে চেয়ে দেখি। সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রতিবেশের অন্তঃস্থিত বিরোধকে প্রকাশ করা উপন্যাসের উদ্দেশ্য নয়, প্রতিবেশের অর্থাৎ জীবন-অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের জন্য এই বিরোধের যে রূপান্তর ঘটে তাকে ব্যক্ত করাই উপন্যাসের লক্ষ্য। শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজে (Class Society) প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে এত বেশি পার্থক্য থাকে যে, উপন্যাস কালক্রমিক না হয়ে পারে না। অর্থাৎ গতিশীল প্রত্যক্ষ বাস্তব উপন্যাসে প্রতিফলিত হবে। উপন্যাসের চরিত্রের ক্রিয়া ও অনভূতি বহির্জগৎ থেকে বিচার করাই শ্রেয়। উপন্যাস সেইজন্য বাস্তবাশ্রয়ী, জগতের বিভিন্ন কোণ থেকে নায়কের কতকগুলি পরিপ্রেক্ষিত-সমষ্টি। সুতরাং উপন্যাস সেই সমাজের মধ্যেই পরিপুষ্ট হতে পারে যে-সমাজে মানুষের অভিজ্ঞতার তারতম্য এত বেশি সুস্পষ্ট যে,

বহির্জগৎকে আশ্রয় না করে উপায় নেই। অভিজ্ঞতার এই তারতম্য সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের জন্যই সম্ভব এবং এর মূলে রয়েছে মানুষিক বৃত্তির বিভেদ বৃদ্ধি (Increased Differentiation), জীবনের গতি ও দ্বন্দ্বমূলক (Dialectical) ধারা উপলব্ধি। তাই উপন্যাসের প্রকৃত জনয়িতা হল ধনতান্ত্রিক সমাজ (Capitalist society)। কডওয়েল বলেন

Poetry concentrates on the immediate affective associations of the word, instead of going first to the object or entity symbolised by the word and then drawing the affective association from that. Since words are fewer than the objects they symbolise, the affects of poetry are correspondingly condensed but poetry itself is correspondingly cloudy and ambiguous. This ambiguity is in fact a by-product......It is an approach to the more instinctively common part of man's consciousness. It is an approach to the secret unchanging core of the genotype in adapted man. Hence the inportance of physiological introversion in poetry.

This genotype is undifferentiated because it is relatively unchanging. Hence the timelessness of poetry as compared to the importance of time sequence in the novel. Poetry speaks timelessly for one common 'I' round which all experience is orientated. In poetry all the emotional experiences of men are arranged round the instincts, round the 'I'. Poetry is a bundle of instinctive perspectives of reality taken from one spot. Precisely because it is cloudy and ambiguous, its view is far-reaching ; its horizon seems to open and expand. ...

But the novel goes out first to reality to draw its subjective associations from it. Hence we do not seem to feel the novel 'in us', we do not identify our feelings with the feeling-tones of the novel. We stand inside the mock world of the novel and survey it ; at the most we identify ourselves with the hero and look round with him at the 'otherness' of his environment. The novel does not express the general tension between the instincts and the surroundings, but the

changes of tension which take place as a result of change in the surroundings (life-experience). This incursion of the element (reality as a process) so necessary in a differentiated society where men's time-experiences differ markedly among themselves, means that the novel must particularise and have characters whose actions and feelings are surveyed from without. Poetry is internal—a bundle of 'I' perspectives of the world taken from one point, the poet. The story is external—a bundle of perspectives of one 'I' (the character) taken from different parts of the world.

Obviously the novel can only evolve in a society where men's experiences do differ so markedly among themselves as to make this objective approach necessary, and this difference of experience is itself the result of rapid change in society, of an increased differentiation of functions, of an increased realisation of life as process, as dialectic.

(Christopher Caudwell : Illusion and Reality)

উপন্যাস বুর্জোয়া সমাজের (Bourgeois Society) শুধু সাধারণ সৃষ্টি নয়, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ-সৃষ্টি শুধু বুর্জোয়া শিল্পীর গৌরব নয়, বুর্জোয়া-যুগোত্তর শিল্পীদের কাছে উপন্যাস অমূল্য সাহিত্য। শিল্পের এই নূতন রূপ যাঁদের সৃজনী-শক্তির প্রভাবে একদিন পাঁপড়ি মেলে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, অদূর ভবিষ্যতে সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সে-রূপ কি মলিন হয়ে শুকিয়ে যাবে? উপন্যাস ধনতান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাবের সময় জন্ম নিয়ে, ধনতন্ত্রের যৌবন-কালে শিল্পের শিখরে আরোহণ করে আজ ধনতন্ত্রের জরাজীর্ণ বার্ধক্যে কি তার সমস্ত অতীত মহিমা হারাবে? বিরাট শক্তির আহ্বানে একদিন মানুষের সামনে যে বৃহৎ জীবন, বৃহৎ সমাজের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল, আজ কি আরএক নূতনতর শক্তির আহ্বানে উন্নততর মানুষের সামনে তদপেক্ষা বৃহত্তর জীবনের, বৃহত্তর সমাজের সম্ভাবনা নেই? তাই যদি থাকে, মানুষ যদি আরও শক্তিমান হয়ে থাকে, সমাজ যদি সুন্দরতর হবার দাবী করে, তাহলে যে সমাজান্তর্গত মানুষ একদিন উপন্যাসের উপাদান সরবরাহ করেছিল, আজ কেন সে আরো মূল্যবান উপাদান সরবরাহ করবে না? অভাব কিসের? শিল্পীর? না, মানুষ ও তার সমাজের? শিল্পীর সেই সৃজনী-প্রতিভা, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি

সন্ধানের সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কোথায়, যে-দৃষ্টি প্রভাত-সূর্যের মতো অন্ধকার ভেদ করে একদিন মাটি স্পর্শ করেছিল ?

উপন্যাসের সর্বপ্রধান উপজীবিকা হচ্ছে ব্যক্তি। সমাজের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তির যে-সংগ্রাম তারই কাহিনী উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই কারণেই মানুষ ও সমাজের মধ্যে সাম্য যখন আর বজায় রইল না, মানুষ যখন নিজেকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈনিক হিসাবে আবিষ্কার করল, একমাত্র তখনই সম্ভব হলো শিল্পকে এই নূতন রূপে ভূষিত করা, তখনই হলো উপন্যাসের জন্ম। উপন্যাসের ঠিকুজি মিলিয়ে দেখলে রেনেসাঁস্-এর পূর্বেও যে তার অঙ্কুর-জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু সে-জীবন উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজে যখন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হলো তখন উপন্যাস প্রবেশাধিকার পেল শিল্পের মহাসভায়। পৃথিবীর দু'টি শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকা হলো "ওডেসী" (Odessey) ও "রোবিন্‌সন্ ক্রুসো" (Robinson Crusoe), কিন্তু দুটির মধ্যে আকাশ-মাটি ব্যবধান নেই কি ? ওডেসীউস্ হলো ইতিহাস-বর্জিত সমাজের মানুষ, যে-সমাজে কাল্পনিক ও বাস্তবের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, সময় যেখানে বিভীষিকা-শূন্য। ঝঞ্ঝাতাড়িত সমুদ্রবক্ষে ভ্রাম্যমাণ ওডেসীউস্ সেইজন্য নির্ভীক ও নিরাকুল, কারণ ওডেসীউস্ জানে তার জীবনের নাবিক অমর্ত্যলোকের দেবতা, ঝঞ্ঝা যাঁর ক্রোধ, পোত-দুর্ঘটনা ইথাকায় প্রত্যাবর্তনের পথে যাঁর শেষ পরীক্ষার কৌশল। এ-সব ওডেসীউস্ জানে বলেই সে নির্বিকার, নিশ্চিন্ত। মানুষকে পরীক্ষা করছেন দেবতা, শান্তিময় জীবন পুনর্লাভের পূর্বে দেবতার সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ওডেসীউস্-এর কাছে গৌরবের হলেও জয়-পরাজয়ের সংশয় তাতে নেই। রোবিন্‌সন্ ক্রুসো তা নয়। কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) লিখেছেন

> This eighteenth century individual, constituting the joint product of the dissolution of the feudal form of society and of the new forces of production which had developed since the sixteenth century, appears as an ideal whose existence belongs to the past, not as a result of history, but as its starting point.

এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষটি হচ্ছে একদিকে ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং আরএকদিকে ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে নূতন উৎপাদন-শক্তির

ক্রমবৃদ্ধি হয়েছে—সেই দুয়ের সংযুক্ত সৃষ্টি। আদর্শ হিসাবে এই ব্যক্তিটির অস্তিত্ব অতীতে মনে হয় ইতিহাসের প্রতিফল বলে নয়, অতীতে এর যাত্রারম্ভ বলে। ওডেসীউস্-এর কোনো ইতিহাস ছিল না। পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় ওডেসীউস্ বাস করত, দেবতাদের সঙ্গে ছিল তার পরিচয়। রোবিন্সন্ অতীতকে পরিহার করে নিজের ইতিহাস নিজেই গড়বার জন্য প্রস্তুত হল। রোবিন্সন্ হল নূতন মানুষ, যে প্রকৃতির অভিভাবক হতে চায়, শত্রুকে সংগ্রাম করে পরাজিত করতে চায়। রোবিন্সন্-এর জগৎ হচ্ছে বাস্তব জগৎ, বস্তুর মূল্যের বোধশক্তি ও অনুভূতি তার মধ্যে জীবন্ত। ঝড় সেখানে দেবতার ক্রোধের অভিব্যক্তি নয় বলেই রোবিন্সন্ জাহাজ ও তার কার্গো নিয়ে বিপন্ন হয়,—মানুষ হয় জলদস্যু, বিদ্রোহী, পাশবিক ও দয়ামায়াহীন। কিন্তু ক্রুসোর নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস, অসীম শ্রদ্ধা। তার আশার এই সারল্যের জন্যই সে ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিড়ম্বনাকে জয় করে, প্রকৃতির বৈরিতা ও সহযাত্রীদের বিদ্রোহকে দমন করে, সমুদ্রপারে তার আদর্শ উপনিবেশের সন্ধান পেল। নির্বাসিত রুশবাসীর কাছে ক্রুসো তার অভিজ্ঞতা ও দ্বীপবাসীদের অভ্যর্থনার কাহিনী বর্ণনার সময় বলল

They were exceedingly taken with the story, and especially the prince, who told me with a sigh, that the true greatness of life was to be masters of ourselves.

সকলেই আমার কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল, বিশেষ করে রাজকুমার। রাজকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আমাকে বললেন যে, নিজেদের ভার সম্পূর্ণ নিজেরা গ্রহণ করাই হচ্ছে জীবনে সত্যকার মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া।

ক্রুসোর সমুদ্রযাত্রা শেষ হল ইথাকায় প্রত্যাবর্তনে নয়, বিচক্ষণ টেলিমেকাস্ বা সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি পেনেলোপ্-এর সাদর অভ্যর্থনাতে নয়, সাইবেরিয়াতে শেষ-যাত্রায় এবং এল্‌বি-তে পুনরাগমনে। সেখানে রোবিন্সন্-এর লাভ হল কি ?

Here my partner and I found a very good sale for our goods, as well those of China as the sables, etc., of Siberia: and dividing the produce, my share amounted to three thousand four hundred and seventy-five pounds seventeen shillings and

three pence, including about six hundred pounds' worth of diamonds which I purchased at Bengal.

এখানে আমি ও আমার অংশীদার দুজনেই প্রচুর পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পেলাম। যেমন চীনের জিনিস তেমনি সাইবেরিয়ার সেবল্ও বিক্রী হল। পণ্য বখ্রা করে আমার অংশে পেলাম মোট ৩৪৭৫ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৩ পেন্স এবং এর মধ্যে বাঙলা দেশ থেকে কেনা প্রায় ৬০০ পাউণ্ড মূল্যের ডায়মণ্ড ছিল।

ওডেসীউস্ ও রোবিন্সন্ ক্রুসো দু'জনের জীবনই অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী এবং দুজনেই শেষকালে শান্তিতে অবসর গ্রহণ করল। কিন্তু পার্থক্য এইখানে যে ওডেসীউস্-এর জীবন-কাহিনী হল গৃহাভিমুখী, ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজের দ্বীপাবাস ইথাকায় প্রত্যাবর্তন, আর রোবিন্সন্-এর কাহিনী বহির্মুখী, গৃহাভিমুখে নয়, গৃহান্তরে। ক্রুসো হল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা, প্রকৃতিকে সংগ্রাম-প্রতিযোগিতায় আহ্বান করে তাই সে জয় করল। ধনতান্ত্রিক সমাজের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ক্রুসো সাম্রাজ্যবাদের বীজ বপন করল। সে-বীজ আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে, পৃথিবীব্যাপী তার শাখা-প্রশাখা। ক্রুসো একদিন পণ্য বিক্রয়ের যে-মুনাফাতে তার অসমসাহসিক কার্যের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশপথে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আজ সেই মুনাফা, সেই টাকা-আনা-পাই, মানুষের পারস্পরিক আন্তরিক সম্বন্ধ ও আত্মীয়তাকে প্রাণহীন আর্থিক সম্বন্ধে পরিণত করেছে। একসময় সেইজন্য ধনতন্ত্রের শৈশবাবস্থায় মানুষের জীবন যখন বিরাট শক্তির আভায় সমুজ্জ্বল ছিল, ধনতন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট নূতন বাস্তব ক্ষেত্রে যখন মানুষকে পরিপূর্ণরূপে দেখা যেত, তখন উপন্যাস মানবচরিত্র সৃষ্টিতে শিল্পরাজ্যে যে যুগান্তর এনেছিল, বর্তমানে চরিত্র সৃষ্টির সে-শক্তি উপন্যাসে লোপ পেয়েছে। তার কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজের আজ বিকৃত রূপ—তার মৃত্যু-মলিন মুখের উপর আজ সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা। মানুষ আজ তাই বিকৃত, তার পূর্ণরূপের সে-জৌলুষ, জীবনের সে দীপ্তি আজ ম্রিয়মান। ধনতন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু তাহলে উপন্যাসের মৃত্যুও কি অবশ্যম্ভাবী ?

উপন্যাসের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী নয়। সমাজতন্ত্র উপন্যাসকে পুনর্জীবন দেবে। সমাজ ও সামাজিক মানুষই যখন উপন্যাসের প্রধান উপাদান, তখন সমাজের

উন্নততর অবস্থায় রূপান্তরের ফলে উপন্যাসের উপাদান আরো উন্নীত হবে। একদিন নূতন সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিজের বিরাট শক্তির পরিচয় পেয়ে, মানুষের রূপ সমাজের বুকে যতখানি পূর্ণতা লাভ করেছিল, আজ আর এক নূতনতর সমাজের সুমুখে দাঁড়িয়ে, নিজের বিরাটতর শক্তির পরিচয় পেয়ে, মানুষের রূপ সমাজের বুকে কি আরো বেশি পূর্ণতা লাভ করবে না? আজ সেই উন্নততর মানুষ ও সমাজ যখন পৃথিবীর দশমাংশের একাংশ সোভিয়েট য়ুনিয়নে তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং প্রসারলাভের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে, তখন কেন উপন্যাস তার সেই লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবে না, তার উপাদানেরই বা কেন অভাব থাকবে?

উপন্যাসের পুনর্জীবনের জন্য পুনরায় তাকে ঐতিহাসিক ও কাব্যিক গুণে মণ্ডিত করা প্রয়োজন। একদিন যে ঐতিহাসিক (Historical) ও কাব্যিক (Epic) বৈশিষ্ট্যের জন্য তার বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছিল, আজ সেই ঐতিহাসিক ও কাব্যিক গুণকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। উপন্যাসের এই দুটি গুণ সম্বন্ধে সেইজন্য উদীয়মান ধনতান্ত্রিক যুগের, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের মতামতের ও সাহিত্যের প্রণিধান একান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হেন্‌রী ফিল্‌ডিং উপন্যাসের এই ঐতিহাসিক ও কাব্যিক গুণের উপর বিশেষ প্রাধান্য আরোপ করেছিলেন। ফিল্‌ডিং তাঁর "The History of Tom Jones—A Foundling" নামক বিখ্যাত উপন্যাসের একটি অধ্যায়ে বলেছেন

Though we have properly enough entitled this our work a history, and not a life;....yet we intend in it rather to pursue the method of those writers who profess to disclose the revolutions of countries, than to imitate the painful and voluminous historian, who, to preserve the regularity of his series, thinks himself obliged to fill up as much paper with the details of months and years in which nothing remarkable happened, as he employs upon those notable eras when the greatest scenes have been transacted on the human stage. Such histories as these do in reality very much resemble a newspaper, which consists of just the same number of words, whether there be any news in it or not.

(Book II Chap. I).

"যদিও এই পুস্তকখানিকে জীবন-কাহিনী না বলে ইতিহাস বলা হয়েছে, তাহলেও এর মধ্যে আমরা সেই সব লেখকদেরই অনুসরণ করব যাঁরা দেশের বিপ্লবকে প্রকাশ করতে চান এবং নীরব ঐতিহাসিকের মতো বৎসরের ও মাসের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে, সামান্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তৃপ্তি পান না। এই সব ইতিহাস দৈনিক সংবাদপত্রের মতো শুধু সমান সংখ্যক শব্দে পূর্ণ থাকে, সে-শব্দ সংবাদ হোক্ না হোক্ সে-দিকে কোনো দৃষ্টি থাকে না।" ফিল্‌ডিং-এর এই কথার অর্থ হচ্ছে এই যে ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য হবে পরিবর্তন, কার্যকারণ সম্বন্ধ, সঙ্কট (crisis) ও বিরোধ (conflict) শুধু নিছক বিষয়ীভূত বিশ্লেষণ (Subjective Analysis) নয়। উক্ত উপন্যাসের আর একটি অধ্যায়ে ফিল্‌ডিং ঔপন্যাসিকের দুটি প্রধান গুণের কথা উল্লেখ করেছেন: (১) প্রতিভা (Genius), (২) বিদ্যা (Learning)। প্রতিভা হচ্ছে দুটি নির্দিষ্ট শক্তির সমন্বয়, উদ্ভাবন-শক্তি (Invention) ও বিচারশক্তি (Judgement)—

...I shall here venture to mention some qualifications, every one of which are in a pretty high degree necessary to this order of historians. The first is genius, without a full vein of which, no study, says Horace, can avail us. By genius I would understand that power, or rather those powers of the mind, which are capable of penetrating into all things within our reach and knowledge, and of *distinguishing their essential difference.* These are no other than invention and judgment; and they are both called by the collective name of genius, as they are of those gifts of nature which we bring with us into the world; concerning each of which, many seem to have fallen into very great errors; for by invention, I believe, is generally understood a creative faculty, which would indeed prove most romance writers to have the highest pretensions to it; whereas by invention is really meant no more, and so the word signifies, than discovery, or finding out; or to explain it at large, *a quick and sagacious penetration into the true essence of all the objects of our contemplation.* This I think, can rarely exist without the concomitancy of judgment; for how we can be said to have discovered the

true essence of two things, without discerning their difference, seems to me hard to conceive···But ..they are not sufficient for our purpose without a good share of learning; for which I could again cite the authority of Horace, and of many others, if any was necessary to prove that tools are of no service to a workman when they are not sharpened by art, or when he wants rules to direct him in his work, or has no matter to work upon. All these uses are supplied by learning; for nature can only furnish us with capacity, or, with the tools of our profession : learning must fit them for use, must direct them in it, and, lastly, must contribute part at least of the materials.

(Book IX, Chap. I)

"এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ সম্বন্ধে এইবার আমি কিছু বলব। প্রথম হচ্ছে প্রতিভা, যা ভিন্ন হোরেস বলেন, আমাদের সমস্ত অধ্যয়নই বৃথা। প্রতিভা বলতে আমি সেই শক্তি বা মানসিক শক্তিসমষ্টি বুঝি যা আমাদের যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তাদের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে বিচার করতে সমর্থ। এই শক্তি হচ্ছে উদ্ভাবন ও বিচারশক্তি এবং এ দুয়ের সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিভা আখ্যা দেওয়া হয়। এই প্রত্যেকটি শক্তি সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। উদ্ভাবন-শক্তি ব্যবহৃত হয় সৃজনী-শক্তির অর্থে এবং অনেক রোমান্টিক লেখক এই অর্থের সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রতিভার ভাণ করেন। কিন্তু উদ্ভাবন বলতে অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করা ছাড়া অন্য কিছু বোঝায় বলে আমার ধারণা নেই। অর্থাৎ উদ্ভাবনের অর্থ হচ্ছে আমাদের চিন্তার বিষয়গুলির ভিতর প্রবেশ করে তাদের সারটুকুকে উপলব্ধি করা। বিচার ভিন্ন এই মর্ম-সন্ধান সম্ভব নয়, কারণ দুটি বিষয়ের অন্তঃস্থিত সত্যকে আমরা কেমন করে উপলব্ধি করব দুটির পার্থক্যকে বিচার না করে।···কিন্তু বিদ্যা বা জ্ঞান ভিন্ন এই দুই শক্তিরও কোনো কার্যকারিতা নেই। এ-বিষয়ের স্বপক্ষে শুধু হোরেস নন, অনেকের মতই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অস্ত্র কোনো কাজে না ব্যবহৃত হলে অথবা অস্ত্র ব্যবহার করবার মতো উপাদান না থাকলে শ্রমিকদের কোনো স্বার্থ নেই। একমাত্র শিক্ষাই এই উপাদান সরবরাহ করতে পারে, কারণ প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা পাই শক্তি বা অস্ত্র এবং শিক্ষা সেই অস্ত্রকে ব্যবহারযোগ্য করে উপাদান সংগ্রহ করে।"

এ-যুগের ঔপন্যাসিক যখন ফিল্‌ডিং-এর এই দৃষ্টি দিয়ে উপন্যাসকে বিচার করবেন তখন পুনরায় নূতন বাস্তবের জন্ম হবে। বর্তমান জগতের সমস্ত বিষয়গুলির অন্তঃস্থিত সত্য ও বিভেদকে যাচাই করবার এবং মানবতার একত্বকে উপলব্ধি করবার শক্তি ঔপন্যাসিক যেদিন ফিরে পাবেন, সেদিন সত্যই উপন্যাসও তার লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবে। এ-কথার অর্থ এই নয় যে, ফিল্‌ডিং বা অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাসই আদর্শ সৃষ্টি। আজকে যদি কোনো ঔপন্যাসিক সমাজের সমগ্রতাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চান তাহলে তাঁকে প্রথম ফিল্‌ডিং-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের ও সমাজের যে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে। ফিল্‌ডিং ঔপন্যাসিকের যে-গুণের কথা উল্লেখ করেছেন সেই গুণ আজকের কোনো ঔপন্যাসিককে দাবী করতে হলে তাঁকেও সমাজের অন্তঃস্থলের বৈপ্লবিক স্পন্দনকে প্রকাশ করতে হবে। আধুনিক মনস্তত্ত্ব (Psychology) মানবচরিত্র সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছে সত্য, মানুষের গভীরতর অবচেতন মনে ডুব দিয়ে অনেক গুপ্ত মাণিক্যের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু শুধু এর দ্বারা মানবচরিত্রের সম্পূর্ণতাকে বোঝা যায় না, মানুষের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার উপর সুবিচার করা হয় না। আধুনিক মনোবিকলনতত্ত্ব (Psychoanalysis) মানুষের জ্ঞানের সম্ভার যে অনেক বাড়িয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং কোনো ঔপন্যাসিক আজ জ্ঞানের এই দিকটিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু শুধু জ্ঞানের সাহায্যেই ব্যক্তির পূর্ণরূপকে বিচার করা যায় না। সামাজিক মানুষকে সমাজের পটভূমিকায় বিচার করতে হবে, সেইজন্য প্রয়োজন সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology) ও ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (Materialistic Interpretation of History) অধ্যয়ন করা। তাহলেই ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে, ব্যক্তিত্বও বিকশিত হয়ে উঠবে। ব্যক্তি সমগ্র সমাজের একটি অংশ এবং এই সমাজের আইনকানুন, প্রিজম্-এর ভিতর দিয়ে আলোর রশ্মি যেমনভাবে প্রবেশ করে, ব্যক্তির মনের যন্ত্রপাতিতে ঠিক তেমনিভাবে বিয়োজিত (Decomposed) ও প্রতিসৃত (Refracted) হয়ে তাকে পরিবর্তন করে ও পরিচালনা করে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির রূপ খণ্ডরূপ, বিকৃতরূপ। গতিশীল সমাজের তরঙ্গক্ষুব্ধ বক্ষে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির রূপই পূর্ণ এবং সেই পূর্ণরূপকে প্রস্ফুটিত করাই শিল্পীর লক্ষ্য।

আজ ধনতন্ত্রের যে ক্ষয়িষ্ণু রূপ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিজম্-এর বীভৎসতার

মধ্যে মূর্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে মানুষকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে ও হবে। মুমূর্ষু রুগীর যেমন নানারকম অসংলগ্ন উপসর্গ দেখা দেয়, তেমনি ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রের শেষ জটিল উপসর্গ আজ সাম্রাজ্যবাদ-বনাম-ফ্যাশিজম্-এর শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সঙ্গে রয়েছে ব্যাধি, বেকার সমস্যা, অত্যাচার, ব্যভিচার, শোষণ। বহির্জগতের এই ক্লিন্ন পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগতে এর প্রতিফলন ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে। একাধারে এই দুই মোহড়ায় (Fronts) মানুষ আজ সংগ্রামরত অক্লান্ত সৈনিক এবং সংগ্রামে মানুষের জয় অবশ্যম্ভাবী,। সভ্যতার প্রতিটি স্তর ও সীমান্ত মানুষ অতিক্রম করেছে জয়গৌরবে মহিমান্বিত হয়ে, আজও তাই করবে। ধাবমান ইতিহাসের কণ্ঠোচ্চারিত এ-সত্যের পরাজয় নেই। আজ এই সত্যকে উপলব্ধি করলে উপন্যাস পুনর্জীবন লাভ করবে, প্রাণবান চরিত্রের কলধ্বনিতে উপন্যাস পুনরায় মুখর হয়ে উঠবে। ধনতন্ত্রের মৃত্যুতে উপন্যাসের মৃত্যু হবে না, কারণ উপন্যাসের মূল উপাদান মানুষ ও সমাজ পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করবে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে। মানুষ তখন মহত্তর হবে, সমাজ তখন সুন্দরতর হবে, উপন্যাসও তখন শিল্পের উন্নততর সোপানে আরোহণ করবে।

সপ্তম অধ্যায়

উপন্যাসের ঐতিহাসিক ধারা

বুর্জোয়া সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান হল উপন্যাস। বুর্জোয়াশ্রেণীর অহঙ্কার, বুর্জোয়াশ্রেণীর গৌরব শিল্পের এই নূতন রাজ্য আবিষ্কারে। মানবরাজ্যের একটি নিভৃত কোণের স্বপ্নপুরীতে যে উপেক্ষিতা শিল্পকন্যা ঘুমে অচেতন ছিল, নূতন বুর্জোয়া সমাজের আলোকোদ্ভাসিত জীবনের উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত শিল্পী তাঁর শক্তিমান কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে তাকে জাগিয়ে তুললেন। ঘুমন্ত স্বপ্নপুরীতে প্রাণস্পন্দন অনুভূত হল, নূতন সৌন্দর্যে মানবজীবনের এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হল। উপন্যাস সেই জাগ্রত শিল্পকন্যা, সেই নূতন রাজ্য।

মধ্যযুগের অবসানের সময় ইতালী ও ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলি প্রথম গাল্পিকের জন্ম দিয়েছিল সত্য, চসার (Chaucer) ও বোকাচ্চোর (Boccaccio) মধ্যে ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল মানবচরিত্রের প্রতি তাঁদের কৌতুহলী দৃষ্টিতে। তখনই আভাস পাওয়া গিয়েছিল যে শিল্পের একটি নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হবে যেখানকার সিংহাসনে মানুষ উপবেশন করবে রাজমুকুট মাথায় দিয়ে, মানুষের জীবন মানুষের সুখদুঃখ, যেখানে রূপায়িত হয়ে মানুষকে আরো মহিমামণ্ডিত করবে। মধ্যযুগের অবসানের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো উপন্যাস রচিত না হলেও, সে-শতাব্দীতে দর্শনের বিকাশের ফলে পরবর্তী শতাব্দীতে উপন্যাসের জয়বার্তা ঘোষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী ইংরেজী উপন্যাসের গৌরবময় কাল, কারণ তার পশ্চাতে ছিল ইংরেজী দর্শনের গৌরবময় যুগ। বুর্জোয়া বিপ্লবের সৃষ্টি এই ইংরেজী দর্শন ছিল গভীরভাবে বস্তুতান্ত্রিক।

মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে যখন নূতন ধনতান্ত্রিক সভ্যতা তার প্রভাতরশ্মি বিকীর্ণ করে উদীয়মান, তখন সেই যুগসন্ধিক্ষণে রাবেলেয়াস্ (Rabelais) ও সার্ভানটিস্-এর (Cervantes) কাছে উপন্যাস নূতন জীবনে দীক্ষিত হল। একদিকে নূতন যুগের বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝার আবর্তে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বিবর্ণ বিশীর্ণ সামন্ততন্ত্র নবজাত

ধনতন্ত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করে বিদায় গ্রহণ করছে, আরএকদিকে নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন আদর্শের জয়ধ্বনি, মানুষের ও সভ্যতার নবজীবনের শঙ্খধ্বনি। রাবেলেয়াস্ ও সার্ভানটিস্ সেইজন্য একদিকে পুরাতন দিনের প্রতি যেমন বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন, তেমনি নূতনকেও বিচার করে শ্রদ্ধার সহিত আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেক্সপীয়রও তাই করেছেন, এবং রেনেসাঁস্-এর যুগের শিল্পীদের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সেইখানেই। এ-যুগের শিল্পীরা অনুরূপ যুগসন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়েছেন, প্রতিপালিত হয়েছেন। আজও ঠিক তেমনি আরএক ক্ষুব্ধ বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝার মঞ্জীর পায়ে বেঁধে সভ্যতার ও সংস্কৃতির নৃত্য শুরু হয়েছে, যার আবর্তে ও আঘাতে পুরাতন ধনতন্ত্রের জরাজীর্ণ কাঠামোটি ভেঙে পড়ছে এবং সমাজতন্ত্রের আগমনী মন্ত্রিত হচ্ছে, অথচ শিল্পীরা শুধু সমরক্ষেত্রের পৈশাচিক ধ্বংসলীলাই দেখছেন, মানুষের প্রকৃতি তাঁদের কাছে অশ্রদ্ধেয় মনে হচ্ছে।

সার্ভানটিস্-এর সৃষ্টির বৈপ্লবিক প্রকৃতি অন্তর্নিহিত। জীবনের প্রতি সার্ভানটিস্-এর মনোভাব তাঁর সৃষ্ট কুইকসোট্ ও সাঙ্কোর চরিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই দুটি চরিত্রের বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে। এইদিক থেকে বিচার করলে সার্ভানটিস্-এর উপন্যাস রাবেলেয়াস্-এর আরএকধাপ উপরে, কিন্তু দুজনেই একত্রে ঔপন্যাসিকের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। রাবেলেয়াস্ দিয়ে গিয়েছিলেন ভাষার কাব্য ও হাস্যরস, সার্ভানটিস্ দিয়ে গিয়েছিলেন অনুভূতির কাব্য ও ব্যঙ্গরস। দুজনে শুধু শিল্পীই ছিলেন না, কর্মীও ছিলেন এবং 'খাঁটি শিল্পী'র যে করুণ আর্তনাদে আজকের পরিবেশ কলুষিত হয়েছে সে-সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণাও ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকেরা যে-সম্পদ পেয়েছিলেন, তা সত্যই সহজলভ্য নয়। রাবেলেয়াস্ ও সার্ভানটিস্-এর পরবর্তী যুগের ঔপন্যাসিকেরা সে-সম্পদের কিভাবে সদ্ব্যবহার করেছেন দেখা উচিত। এই সম্পদের মর্যাদা ইংলণ্ডের ঔপন্যাসিকেরা অর্ধশতাব্দী যাবৎ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, যদিও ফরাসী বা স্পেনীয় শিল্পীদের মতো উৎকর্ষতার দিক দিয়ে সমশিখরে তাঁরা আরোহণ করতে পারেননি। উপন্যাস প্রধান অস্ত্র হলেও রাজনৈতিক প্রচারপত্র ছিল না। স্বাস্থ্যকর প্রতিবেশের মধ্যে বর্ধিত হয়ে উপন্যাস বুর্জোয়াশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধিদের কাছে কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

ঔপন্যাসিক তাঁর পারিপার্শ্বিক নরনারীর চরিত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে এইটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয়। মানুষ দেখে আতঙ্কে তাঁরা আত্মগোপন করেননি, মানুষের সাহচর্য তাঁদের কাছে অশ্রদ্ধেয় মনে হয়নি, মানুষের শক্তিতে তাঁদের সংশয় জাগেনি মনে। মানুষের দৃঢ়তায়, মানুষের জয়ে ও শক্তিতে তাঁদের গভীর বিশ্বাস ছিল, যদিও তাঁরা সমসাময়িক অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতার প্রতি অন্যমনস্কতা দেখাননি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ড্যানিয়েল্ ডেফো (Daniel Defoe), স্যামুয়েল্ রিচার্ডসন্ (Samuel Rechardson), হেন্‌রী ফিল্‌ডিং (Henry Fielding), জর্জ স্মলেট্ (Tobias George Smollett), লরেন্স স্টার্ন (Laurence Sterne) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলেরই বৈশিষ্ট্য হল চরিত্রের জীবন্ত বিশ্লেষণ ও সুসংবদ্ধ ঘটনা-গ্রন্থন। ডেফো, ফিল্‌ডিং ও স্মলেট্ বিষয়-ভূত শিল্পী, এবং রিচার্ডসন্ ও স্টার্ন বিষয়ী-ভূত শিল্পী।

সমালোচকেরা হেন্‌রী ফিল্‌ডিং সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বলে থাকেন যে তিনি উপন্যাসের মধ্যে 'sermon' প্রচার করেছেন, এবং সেইজন্য তাঁর রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। অবশ্য যেকোনো শিল্পের মধ্যে উপদেশ প্রচার করা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ ঢাক পেটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করেন না। কিন্তু ফিল্‌ডিং-এর উপদেশ বাতিল করে দিলেও তাঁর উপন্যাসের মধ্যে যে সামাজিক সমালোচনা আছে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে যে বিচার ও বিশ্লেষণ আছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। ফ্লোবের ও হেন্‌রী জেমস্-এর পূর্বে শিল্প সেবা করে সৌভাগ্যবশত ফিল্‌ডিং জানতেন না যে উপন্যাস রচনা করবার জন্য কৃত্রিম সাহিত্যিক সমাজের কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। বোধ হয় হেন্‌রী ফিল্‌ডিংই সর্বপ্রথম ইংরেজ ঔপন্যাসিক, যিনি মানবজীবনের সত্যকে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা উপন্যাসের আদর্শ বলে জানতেন, এবং জানতেন বলেই নিজের মতো করে সেই সত্যেরই বর্ণনা করে গিয়েছেন। তিনি "Jonathan Wild"-এর জীবনকাহিনীর মধ্যে নির্মমভাবে সেই সত্যকে প্রকাশ করেছেন, যার বিষণ্ণ বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষের কাছে সুইফট্ও মাথা হেঁট করতে সম্মত হবেন। তাঁর ক্রোধ নির্মম ও ভয়ঙ্কর, কারণ সে হচ্ছে মানুষের অবনতির প্রতি জীবন্ত মানুষের ক্রোধ।

আরএক শ্রেণীর সমালোচক ফিল্‌ডিং-এর কল্পনাশক্তির অভাব সম্বন্ধে কটূক্তি করেছেন। ফিল্‌ডিং আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মতো মানবচরিত্রের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ করেননি সত্য, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রই সেজন্য পাণ্ডুর হয়নি। ঔপন্যাসিক বলতে ফিল্‌ডিং প্রধানত ঐতিহাসিকই বুঝতেন, এবং বহির্জগৎই ছিল তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর রচিত নায়কনায়িকা প্রতিবেশের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবন্ত ও মুখর। তিনি যে-যুগে বাস করতেন সে-যুগ নিষ্ঠুর যুগ, বিজয়ী ধনতন্ত্রের সংগ্রামকাতর যুগ, শিল্প-বিপ্লবের পূর্ববর্তী লুণ্ঠিত ধনসঞ্চয়ের যুগ। সুতরাং বিদ্রূপের কর্কশ বাণী যা তাঁর কণ্ঠ থেকে মধ্যে মধ্যে উৎসারিত হয়েছে, তা একেবারে অসমর্থনীয় ও তিরস্কারযোগ্য নয়। কিন্তু তিনি কখনো নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, অর্থাৎ শিল্পী হয়ে কোনোদিন মানুষকে বা জীবনকে অবজ্ঞা করেননি। এখানেই তাঁর শিল্পজীবনের, ঔপন্যাসিক জীবনের চরম সার্থকতা।*

রিচার্ডসন্ মানুষের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে সেখানকার অনেক গভীর অনুভূতিকে আবিষ্কার করলেন। সংবেদ্য উপন্যাস সৃষ্টির তিনিই হলেন অগ্রদূত। বাল্যকালে তরুণী প্রতিবেশিনীদের প্রেমপত্র লিখলেও পরে ঔপন্যাসিক জীবনে তিনি কৃতিত্ব কিছু কম দেখাননি। 'Pamela, Clarissa' ও 'Sir Charles Grandison' প্রভৃতি উপন্যাসগুলির নায়কনায়িকার চরিত্র জীবন্ত ও স্বচ্ছ। ক্লেরিসার করুণ কাহিনী ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে একদিন চোখে জল এনেছিল। ফিল্‌ডিং-এর মতো রিচার্ডসন্ যদি বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে সচেতন হতেন তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনিও একটি আসন দখল করে থাকতেন। রিচার্ডসন্ ইতিমধ্যে বাস্তবকে উপেক্ষা করতে আরম্ভ করেছেন, এবং পরে স্টার্ন্-এর মধ্যে এই মনোবৃত্তি আরো সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নায়ক-নায়িকার মনোরাজ্যের প্রতি রিচার্ডসন্-এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও তিনি গল্প বলতে পারতেন ভাল, কিন্তু স্টার্ন্-এর কোনো বৈশিষ্ট্যই ছিল না। শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হবার সমস্ত গুণই স্টার্ন্-এর ছিল। স্টার্ন্-এর শ্লেষ-জ্ঞান ছিল, বুদ্ধি

* হেনরী ফিল্‌ডিং "Joseph Andrews" (1742), "Jonathan Wild" (1743), "Tom Jones" (1749), "Amelia" (1751) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছেন। ফিল্‌ডিং-এর ঔপন্যাসিক প্রতিভা সম্বন্ধে Frederic T. Blanchard-এর "Fielding, the Novelist" (Oxford Univ. Press) নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

ছিল, কল্পনা ছিল, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, সবই ছিল, শুধু ছিল না বাস্তব জগতের পটভূমিকার উপর নায়কনায়িকার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা। স্টার্ন্ নিজেকে রাবেলেয়াস্ ও সার্ভান্টিস্-এর সমতুল্য মনে করতেন, কিন্তু তাঁর রচনারীতি ও ভাষার নূতনত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি রাবেলেয়াস্ বা সার্ভান্টিস্-এর সমশক্তিমান শিল্পী হতে পারেননি। বাইরন বলতেন যে স্টার্ন্ "preferred whining over a dead ass to relieving a living mother" এবং অধ্যাপক ক্রস্ * স্টার্ন্-এর রচনারীতি, ভাষা, শ্লেষ প্রভৃতি সম্বন্ধেও উচ্চপ্রশংসা করেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে "a man of finer grain"-এর পক্ষে আরো অনেক মূল্যবান সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হত।

ফিল্ডিং বা রিচার্ডসন্ ও স্টার্ন্ কেউ বাস্তবের পরিপূর্ণরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। দৃষ্টি শুধু বহির্মুখী হলে চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না, মানুষের অন্তরলোকে প্রবেশ করবার জন্য যে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন তার অভাব হয়। আবার দৃষ্টি যদি শুধু অন্তর্মুখী হয় তাহলে উপন্যাসের মহাকাব্যিক গুণ নষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র এ দুয়ের সমন্বয়ে বাস্তবের পূর্ণরূপ উপলব্ধি করা যেতে পারে। সার্ভান্টিস্ এই ধরনের বিভেদ কল্পনাও করতে পারতেন না। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের পথে এই দৃষ্টিভেদ ঘটেছে, ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার প্রচেষ্টা চলেছে শিল্পীদের মধ্যে। এই প্রচেষ্টা পরবর্তী দুশতাব্দীর মধ্যে ভিক্টোরীয় যুগ পার হয়ে বিংশ শতাব্দীতে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। একদিকে শ্রমবিভাগ যত জটিলতর হয়েছে, শিল্পীও তত ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের দিকে নজর দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্যকার বিপ্লবী শিল্পী ছিলেন রুশো। রুশো ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন কল্পনাপ্রবণ গদ্যলেখক। রুশো ফরাসী বস্তুতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে পারে। রুশো বলতেন যে প্রকৃতিই একমাত্র মানুষকে পরিবর্তন করে তার উন্নতিসাধন করতে পারে। রুশোর এ-ধারণা ভুল হলেও তিনি এই ভ্রম সাধনা করে শিল্পের উপেক্ষিতা প্রকৃতিকে আবার সসম্মানে শিল্পের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। রুশোর এই দান শিল্পীরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করবে।

অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল উপন্যাসের স্বর্ণযুগ। সার্ভান্টিস্ বা রাবেলেয়াস্-এর

* লরেন্স স্টার্ন্-এর বিস্তারিত সমালোচনার জন্য Wilbur L. Cross-এর "The Life and Times of Laurence Sterne" দ্রষ্টব্য।

মতো শিল্পের উচ্চশিখরে আরোহণ করতে না পারলেও, এবং কল্পনার প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যে বাস্তবকে রূপান্তরিত করা সাধনাতীত হলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকেরা জীবন ও মানুষ সম্বন্ধে নির্ভয়ে, দৃঢ়কণ্ঠে সত্যকথা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হাস্যরস ছিল, শ্লেষ-জ্ঞান ছিল, এবং তাঁরা মানুষকে অনুভব করতে বাধ্য করেছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন বহির্জগৎ আছে, পারিপার্শ্বিকতা আছে, তেমনি অন্তর্জগৎ আছে, অন্তঃপরিবেশ আছে। কোনো জগৎ উপেক্ষণীয় নয়। একটি জগৎ অস্বীকার করে আরএকটিকে স্বীকার করা যায় না। দুই জগতের অধিবাসী হল শিল্পী। পরিবর্তনশীল বহির্জগৎ যেমন সত্য, তেমনি তার ঘাতপ্রতিঘাতে অন্তর্জগতের ভাঙাগড়াও সত্য। এই দুই জগতের প্রভাব প্রতি-প্রভাবে গঠিত মানুষ হচ্ছে জীবন্ত মানুষ, সত্য মানুষ। উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপন্যাসিকের মনে মানুষ সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে শঙ্কা জাগে, সন্দেহ দোলা দিয়ে যায়, তিনি এ-জগৎ ছেড়ে উধাও হবার পথ অনুসন্ধান করেন। মেদস্ফীত ধনতন্ত্রের সর্বগ্রাসী নিষ্পেষণ শুরু হয়েছে, অতএব চারিদিকে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব ক্ষীণ স্বরে ধ্বনিত হল। আজ তারই হট্টগোল, হেন্‌রী জেমস্‌-এর নৈরাশ্যবাদ ও ত্রাহিবৃত্তির জারজ সন্তান হলেন এ যুগের অল্‌ডাস্‌ হাক্স্‌লে ও এইচ্‌. জি. ওয়েলস্‌।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্কট্‌ (Walter Scott) এবং দ্বিতীয়ার্ধে চার্লস্‌ ডিকেনস্‌ (Charles Dickens) ইংলণ্ডের প্রধান ঔপন্যাসিক ছিলেন। স্কট্‌ শিল্পযুগের অবনমিত আবহাওয়া থেকে নির্মুক্ত হয়ে কাল্পনিক, স্বপ্নময় অতীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। একদিক থেকে স্কট্‌ যুগান্তর এনেছিলেন উপন্যাসে, কারণ তিনিই প্রথম মানুষকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করবার আবশ্যকতা অনুভব করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষের যেমন বর্তমান আছে, তেমনি তার অতীতও আছে, এবং এ দুয়ের সমন্বয় করবার তিনি চেষ্টা করেছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-চেষ্টা সম্ভব হয়নি। জীবনের কাব্য ও গদ্য উভয়েরই সমন্বয় হবে উপন্যাসে, রুশোর নৈসর্গিক প্রেমের সঙ্গে ফিল্‌ডিং-এর বিষয়ভূত বলিষ্ঠতা ও স্টার্ন-এর সংবেদন মিলিত হবে—এই ছিল স্কটের আদর্শ। স্কট্‌-এর এ-উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কিন্তু তাহলেও তাঁর ব্যর্থতায় গৌরব আছে। স্কট্‌ কেন ব্যর্থ হয়েছিলেন?

স্কট্‌ প্রতিভাবান শিল্পী হলেও তাঁর গভীর দৃষ্টিশক্তি ছিল না। ফলে তাঁর সৃষ্ট নরনারী ইতিহাসের চরিত্র না হয়ে, তাঁর নিজেরই কাল্পনিক সৃষ্টি হয়েছিল।

তিনি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াকার উচ্চমধ্যবিত্তশ্রেণী ও ব্যবসায়ী অভিজাত-গোষ্ঠীর চরিত্রের উপর নিজে কল্পনার রঙ ফলিয়েছিলেন। স্কট্-এর উপন্যাসের চরিত্রগুলি সেইজন্য কাল্পনিক, কিন্তু ফিল্ডিং করেছিলেন টাইপ-চরিত্র সৃষ্টি। দুজনের মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকের পক্ষে মানুষের চরিত্রকে সত্যভাবে বিচার করা কঠিন হয়েছিল। থ্যাকারে (Thackeray) বুর্জোয়াশ্রেণীকে ঘৃণা করতেন, এবং তাদের বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। কিন্তু কেউ বাস্তব জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে সুস্থিরভাবে বিচার করে তাকে পরিপূর্ণভাবে উপন্যাসে রূপায়িত করেননি।

এই অক্ষমতার কারণ হচ্ছে এই যে ভিক্টোরীয় যুগের শিল্পীরা মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধের উপরের মুখোসটি ছিঁড়ে না ফেলে তাদের চরিত্র আলোচনা করতে পারতেন না। ভিক্টোরীয় যুগ চারিদিক থেকে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার যুগ, চার্টিস্ট আন্দোলনের স্পর্শে সমগ্র দেশ বিপ্লব-মুখর, সশস্ত্র বিদ্রোহের আশঙ্কায় প্রতিবেশ কম্পমান। অর্থের হীন পূজারী বুর্জোয়াশ্রেণীর সাফল্য, কারখানার চিমনির ধোঁয়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মলিনতা ব্যক্তিগত জীবনের দানবীয় বস্তুপ্রীতিকে আদর্শবাদের আভরণে গোপন রাখবার কৃতঘ্ন প্রবৃত্তি—এই হচ্ছে ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের রূপ। কিন্তু এতদূর প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যেও এ-কথা বলা যায় না যে ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিকেরা মানুষকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংরেজী উপন্যাসের যে-অবনতির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, তাকে ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিকেরা উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিলেন, এবং সার্থকও হয়েছিলেন। চার্লস্ ডিকেনস্ উপন্যাসের মহাকাব্যিক গুণ ফিরিয়ে আনেন, এবং নিজের প্রতিভাবলে জীবনের মর্মস্থলে প্রবেশ করে মানুষকে আবার সত্য, জীবন্তরূপে চিত্রিত করেন।

ডিকেনস্ যে তাঁর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখকষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবনের প্রতি আশা বা শ্রদ্ধা হারাননি। তাঁর গভীর দৃষ্টি সমাজের অন্তঃস্থল পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল, এবং সেইজন্যই দুর্বলের প্রতি তাঁর ছিল মানুষিক সহানুভূতি, অন্যায় বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ও প্রতিবাদ ছিল সুস্পষ্ট ও নির্মম। তাঁর উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর চিত্রই ফুটে উঠেছে। ডিকেনস্-এর রসিকতা মধ্যে মধ্যে কর্কশ হলেও তাঁর হাস্যরসবোধ সত্যই প্রশংসনীয়। স্যাম্

ওয়েলার (Sam Weller), বেট্‌সি ট্রট্‌উড্ (Betsy Trotwood) বা জো গার্গারি (Goe Gargery), এরা সকলেই ইংরেজী সাহিত্যে অবিনশ্বর। ডিকেনস্-এর এই বৈশিষ্ট্যের জন্য চেস্টারটন্ (G. K. Chesterton) বলেছেন: "In England…the poor people are the most motley and amusing creatures in the world, full of humorous affections and prejudices and twists of irony....the democracy is really composed of Dickens's characters; for the simple reason that Dickens himself was one of democracy," কিন্তু ডিকেনস্-এর দান অন্যদিক থেকেও কম মূল্যবান নয়। ডিকেনস্-এর সাহিত্য তৎকালীন মানুষের মনে যে শুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল তাকে উপেক্ষা করা যায় না। শ্রেণী-বৈষম্য ভুলে গিয়ে শ্রেণীনির্বিশেষে সকল মানুষের সততায় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করবার গুরুভার ডিকেনস্ গ্রহণ করেছিলেন। সমসাময়িক সমাজের দোষত্রুটি, ব্যভিচার, কুসংস্কার প্রভৃতির প্রতি তাঁর প্রখর সতর্কদৃষ্টি কখনো চঞ্চল হয়নি। তিনি উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। "Oliver Twist"-এর "Poor Law" ব্যবস্থা, "Little Dorrit"-এর "red-tapism", "Nicholes Nicklaby"-র "Private School" ব্যবস্থা প্রভৃতির মধ্যে তিনি সমসাময়িক সমাজের ক্ষতস্থানের উপর সোজা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন, তার জন্য সমাজকে কশাঘাত করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

সর্বশ্রেণীর নরনারীর অদ্ভুত চরিত্রচিত্রণ, অসংখ্য ঘটনা গ্রন্থন, কল্পনাশক্তি ও কাব্য প্রভৃতি হচ্ছে ডিকেনস্-এর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তবু ডিকেনস্ ও স্কট্ উভয়েরই সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে যেন কিসের অভাব আমরা অনুভব করি। নায়কনায়িকার মধ্যে মহানুভবতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। মহৎ চরিত্রসৃষ্টি কেন তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি? কারণ তাঁদের যুগকে তাঁরা গতিশীল মনে করেননি, এবং সেইজন্য কালের প্রবহমাণ ধারায় নায়কনায়িকার চরিত্রও অখণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়নি। বিজয়ী মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তাদের শূন্যগর্ভ জীবনকে লোকচক্ষুর সামনে ব্যক্ত করতেও তাঁরা ভয় পাননি, কিন্তু এ-সবের অন্তর্নিহিত বৃহত্তর শক্তির ক্রিয়া তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, ধনতান্ত্রিক সমাজের হীনতা ও দৈন্যকে তাঁরা পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। এইদিক থেকে ফরাসী ঔপন্যাসিকরা নিষ্ঠাবান, অর্থাৎ সমসাময়িক যুগকে তাঁরা অকপটভাবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

১৮৫৪ সালের New York Tribune পত্রিকায় কার্ল মার্কস্ ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিকদের উল্লেখ করে লিখেছিলেন*

The present brilliant school of novelists in England, whose graphic and eloquent descriptions have revealed more political and social truths to the world than have all the politicians, publicists and moralists added together, has pictured all sections of the middle class, beginning with the 'respectable' rentier and owner of government stocks, who looks down on all kinds of 'business' as being vulgar, and finishing with the small shop-keeper and lawyer's clerk. How have they been described by Dickens, Thackeray, Charlotte Bronte and Mrs. Gaskell ? As full of self-conceit prudishness, petty tyranny and ignorance. And the civilised world has confirmed their verdict in a damning epigram which it has pinned on that class, that it is servile to its social superiors and despotic to it inferiors

রাজনৈতিক প্রচারক বা নীতিবাগীশদের চাইতে অনেক বেশি সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্য ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিকদের সুন্দর বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব ঔপন্যাসিকেরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর ছবি এঁকেছেন, গবর্ণমেণ্টের স্টক-মালিক থেকে শুরু করে খুদে দোকানদার ও উকিলের কেরানী পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি। এই শ্রেণীর অজ্ঞতা, উৎপীড়ন, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতির জীবন্ত বর্ণনা ভিক্টোরীয় ঔপন্যাসিকদের বৈশিষ্ট্য। সভ্য জগৎ আজ তাঁদের মত সমর্থন করে মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ঐ একই অপবাদ-বিদ্ধ করে রেখেছে যে তারা উচ্চতর শ্রেণীর দাস এবং নিম্ন শ্রেণীর উৎপীড়ক। অর্থাৎ মার্কস্ বলেছেন যে মধ্যবিত্তশ্রেণী সমাজের উচ্চস্তরের বুর্জোয়াশ্রেণীর অনুচর, তাদের সেবা করাই মধ্যবিত্তদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এবং এক মিথ্যা অহঙ্কার ও

* মার্কস্-এর এই সমালোচনার সত্যতা প্রমাণিত হবে তাঁর উল্লিখিত ঔপন্যাসিকদের রচনা পাঠ করলে। থ্যাকারের "Vanity Fair", "The History of Henry Esmond", "The Virginians," ডিকেনস্-এর "Oliver Twist," "The Pickwick Papers", "Bleak House", "Hard Times," "A Tale of Two Cities," "Great Expectations", ব্রন্ট-এর "Jane Eyre", এমিলির "Wuthering Heights", গ্যাসকেল-এর "Marry Barton", "Ruth, North and South", "Sylvia's Lovers" প্রভৃতি উপন্যাসগুলি পঠিতব্য।

আত্মমর্যাদায় অন্ধ হয়ে তারা নিম্নের শ্রমজীবীশ্রেণীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। মার্কস্-এর এই উক্তি স্মরণীয়।

এইসময় ফ্রান্সের শিল্পীদের মধ্যে ব্যাল্জাক্ই (Balzac) ছিলেন একমাত্র বিপ্লবী শিল্পী। ব্যাল্জাক্ তাঁর "Comedie Humaire"-এর মধ্যে তাঁর যুগের মানুষের জীবনের সুবৃহৎ পটভূমিকার উপর যে বৈপ্লবিক চিত্র এঁকেছেন, তা যেমন গভীর, তেমনি ব্যাপক, চিত্রাত্মক, চিত্তাকর্ষক ও জীবন্ত। ১৮১৬ সাল থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ফরাসী সমাজের ইতিহাস এমন নিখুঁতভাবে কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষেও আঁকা সম্ভব নয়। ব্যাল্জাক এর রাজনৈতিক মত ছিল প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ফ্রান্সের পক্ষে, কিন্তু মানুষের প্রতি মনোভাব, মানুষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা, সবই বিপ্লব-জাত--জেকোবিনরা যখন নির্মমভাবে ফরাসী সমাজের বন্ধন ছিন্ন করেছিল, য়ুরোপে যখন নেপোলিয়ান্-এর শৌর্য ও জয়গৌরব ধ্বনিত হয়েছিল তখনকার মনোভাব। নেপোলিয়ান্ যেমন সামন্ততন্ত্র ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন, তেমনি ফ্রান্সের "Literary Naroleon" ব্যাল্জাক্ সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ধ্বংস করেছিলেন। ব্যাল্জাক্ সেইজন্য বাধ্য হয়েছিলেন নিজের রাজনৈতিক ও শ্রেণী-সহানুভূতির বিরুদ্ধে অভিজাতগোষ্ঠীর পতনকে সমর্থন করতে এবং নূতন যুগের মানুষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে। এইখানেই বাস্তবের জয় এবং বিপ্লবী রূপকার ব্যাল্জাক্-এর বৈশিষ্ট্য। মার্গারেট্ হার্কনেস্‌কে লিখিত একখানি চিঠির মধ্যে ফ্রিড্রীশ এঙ্গেলস্ ব্যাল্জাক্-এর শিল্পপ্রতিভা সম্বন্ধে এই কথাই বলেছিলেন। এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন

Balzac, whom I consider a far greater master of realism than all the Zolas, . in his 'Comedie Humaine' give us a most wonderfully realistic history of French society, describing in chronicle fashion, almost year by year, from 1816 to 1848, the progressive inroads of the rising bourgeoisie upon the society of nobles that reconstituted itselt after 1815, and that set up again as far as it could the standard of *la vieille politesse francaise*. He describes how the last remnants of this, to him, model society, gradually succumbed before the intrusion of the vulgar, moneyed upstart, or were corrupted by him, how the grande dame, whose conjugal infidelities were but a mode of asserting itself, in perfect accordance with the way she had been disposed of in marriage, gave way

to the bourgeoisie who gains her husband for cash or customers; and around this central picture he groups a complete history of French society, from which, even in economic details, for instance, the rearrangement of real and personal property after the Revolution, I have learnt more than from all the professed historians, economists and statisticians of the period together. Well, Balzac was politically a legitimist; his great work is a constant elegy unto the irreparable decay of good society; his sympathy is with the class that is doomed to extinction. But for all that his satire is never more cutting, his irony more biting than when he sets in motion the very men and women with whom he sympathises most deeply—the nobles. And the only men of whom he speaks with undisguised admiration are his bitterest political antagonists, the Republican heroes of the Cloitre-Saint-Merri, the men who at that time (1830-36), were indeed the representatives of the popular masses. That Balzac was thus compelled to go against his own class sympathies and political prejudices, that he *saw* the necessity of the downfall of his favourite nobles and described them as people deserving no better fate; that he saw the real men of the future where, for the time being, they alone could be found—that I consider one of the greatest triumphs of Realism, one of the greatest features in old Balzac.

ব্যাল্জাক্-এর সঙ্গে গুস্তাভ্ ফ্লোবের-এর (Gustav Flaubert) পার্থক্য অনেক। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি ফ্লোবের-এর অমানুষিক ঘৃণা ছিল। একবার তাঁর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে তিনি তাঁর বন্ধু ল্যুই ব্যুইলেট্‌কে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন: "Laxatives, purgatives. derivatives, leaches, fever diarrhoea, three nights without any sleep, *a gigantic annoyance at the bourgeois*." এবং এই উক্তি থেকেই তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট বোঝা যায়। "I would drown humanity in my vomit" ফ্লোবের লিখেছেলেন। তিনি সমগ্র মানবজাতির উপর এই ঘৃণা উদ্গীরণ করেননি। ১৮৭১ সালের প্যারিস কম্যুন্-এর পর উনবিংশ

শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক সমাজকে লক্ষ্য করেই ফ্লোবের এই কথা লিখেছিলেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি ফ্লোবের-এর অসাধারণ ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও তিনি গণতন্ত্রকে আদৌ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। জনসাধারণের প্রতি তাঁর অনুরূপ ঘৃণাই ছিল। জনতাকে তিনি ভীষণ ভয় করতেন, এবং সেইজন্য ফ্লোবের শিল্পসাধনা করেছেন নিজের গজদন্তমিনারে বসে ক্রুদ্ধ জনতার পাশবিক চিৎকার থেকে বহুদূরে, ক্লিন্ন পারিপার্শ্বিকতার আবিলতার স্পর্শ যেখানে নেই, শুধু আত্মতৃপ্তির বিলাসিতা আছে। এইভাবে নিজের মনোরাজ্যে বন্দী হয়ে আত্মাভিমানী ফ্লোবের শিল্পের নিছক বহিরাশ্রয়িতাতে মনোনিবেশ করেছিলেন। "Madame Bovary"-র ট্যাভার্ন্‌-এর দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর তিনমাস সময় লেগেছিল, উপন্যাসের মধ্যে যেটুকু পাঠকের পড়তে মাত্র তিনঘণ্টা সময় লাগে। অনেকে বলবেন ফ্লোবের স্টাইল্‌-এর উৎকর্ষতার পক্ষপাতী ছিলেন। এ-কথা সত্য হলেও রচনারীতির এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই যার জন্য আজ তাঁকে স্মরণ করা যেতে পারে।

যে-ফ্রান্সের শিল্পী ফ্লোবের, সে-ফ্রান্স হচ্ছে জুন ১৮৪৮ সালের ফ্রান্স, থার্ড এম্পায়ারের ফ্রান্স, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফ্রান্স, প্যারিস্‌ কম্যুন্‌-এর ফ্রান্স। সেইজন্য নিষ্ঠুর ফ্রান্সকে বর্জন করে ফ্লোবের সংগ্রাম থেকে দূরে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন জীবনকে। জীবনকে প্রকাশ করবার জন্য, যুগসত্যকে ব্যক্ত করবার জন্য ফ্লোবের অত্যন্ত উদগ্রীব হলেও, তিনি শেষ পর্যন্ত মুষড়ে পড়েছিলেন, জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষকে, সত্যকে, বাস্তবকে তিনি বরণ করতে পারেননি। উন্নাসিক বিশুদ্ধ শিল্পী হয়েই তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ শিল্পীরা ফ্লোবের-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিল্পের সঙ্গে জীবনের ও সমাজের যোগাযোগ ছিন্ন করেছেন বললে ভুল হয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আরএকজন বিখ্যাত শিল্পী ধনতান্ত্রিক সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে মর্মাহত হয়ে নিজের মনোজগতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন হেন্‌রী জেমস্‌ (Henry James)। য়্যুরোপীয় ধনতান্ত্রিক সমাজ যে ধ্বংসোন্মুখ এবং সেখানে শিল্পীর যে কোনো নূতন কিছু সৃষ্টি করবার শক্তি নেই, সে-বিষয়ে জেমস্‌ সচেতন ছিলেন। তারপর আত্মশক্তির উপর শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন, সভ্যতার অতীত গৌরব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। জেমস্‌ নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাপকাঠি দিয়ে তদানীন্তন জগতের সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করতেন। জেমস্‌-এর রচনার মধ্যে

সেইজন্য বিরোধ বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, যে-বিরোধ আধুনিক প্রায় সমস্ত লেখকদের রচনার বৈশিষ্ট্য। একদিকে তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আবিলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, আরএকদিকে অলঙ্ঘনীয় আত্মাভিমানের বশে ব্যক্তির খণ্ডরাজ্য গড়েছিলেন, এবং পারিপার্শ্বিকতাকে অস্বীকার করে স্ববের মতো সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই পরোক্ষে সমর্থন করেছিলেন। জেমস্-এর এই মনোভাব এ-যুগের জেমস্ জয়স্ (James Joyce), উইণ্ডহাম্ ল্যুইস্ (Wyndham Lewis) প্রমুখ শিল্পীদের মধ্যে স্পষ্টতরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। য়্যুরোপ ব্যাল্জাক্-এর "Comedie Humaine" থেকে বহুদূরে দ্বীপান্তরিত হয়েছে, জেমস্-এর "The Ambassadors", "The Golden Bowl"-এর যাত্রাশেষে জয়স্-এর "Ulysses"-এর জঘন্য ডাব্লিন্ শহর অতিক্রম করে, উইণ্ডহাম্-এর "The Apes of God"-এর ভিতর দিয়ে স্পেংলার, পাউণ্ড, এমন কি "গাজায় চক্ষুহীন" হাক্স্লে পর্যন্ত।

কবে এ-যুগের শিল্পীর ও ঔপন্যাসিকের "এই গাজায় চক্ষুহীন" অবস্থা কেটে যাবে, কবে তাঁরা মুক্ত জীবনাস্বাদে অনুপ্রাণিত হয়ে, মানুষ ও জীবনকে শ্রদ্ধেয় মনে করবেন? আজ জেম্সীয় বা ফ্লোবেরীয় শিল্পের পচা ডিমে তা দিয়ে লাভ কি?

অষ্টম অধ্যায়

আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য

জীবনের সঙ্গে শিল্পের ও সাহিত্যের যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে একথা সর্ববাদিসম্মত। জীবনের ভিত্তি যখন নড়ে যায়, যখন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আঘাতে জীবনের প্রাচীন অর্থ, আদর্শ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, সমস্ত জীবনাকাশে যখন বিচিত্র রঙের রোমাঞ্চ তুলে এক নূতন আদর্শ সূর্যোদয়ের মতো চারিদিকে তার দীপ্ত আহ্বানের গম্ভীর প্রতিধ্বনি তোলে, তখন শিল্পেরও রূপান্তর ঘটে। জীবনের নূতন স্বচ্ছন্দ গতিবেগের সঙ্গে সাহিত্য তখন মিলিত হয়ে যায়। একদিন রুশকবি পুশকিন্ (Pushkin) দুঃখ করেছিলেন যে তাঁর কবিতার সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার মতো মানুষ রাশিয়াতে খুব কম আছে, কারণ রাশিয়াতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব কম। পুশকিন্-এর যুগ কেটে গিয়েছে এখন। এখন রাশিয়াতে জনগণের সামনে সমাজতন্ত্রবাদের যে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তাতে তাদের জীবনের বিস্তৃতি বেড়ে গিয়েছে অনেক, জীবনের অর্থের ও সৌন্দর্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সুন্দরের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা এখন আর নেই। নন্দনশাস্ত্র (Aesthetics) আজ গৃহকোণের বধূর নির্জনতাকে বিসর্জন দিয়ে বেরিয়ে এসেছে মানুষের কোলাহলময় হাটের মাঝখানে, আজ জনগণের জনতাতেই তার বসতি, তাকে আজ সিংহাসন গড়তে হবে ভুয়ো কল্পনার চুনিপান্না দিয়ে নয়, পথের ধূসর ধূলিকণা দিয়ে। তাই ওলেশা (Olesha) ও ব্যাবেলের (Babel) মূল্য আজ কেউ দিতে চাইবে না, কারণ মানুষের নূতন জীবনের জয়গান তাঁরা গাননি, সে-জীবনের উদ্বোধনী বাণী তাঁদের হৃদয়ের কেন্দ্রমাঝে ধ্বনিত হয়নি। অবশ্য শিল্পীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা আমাদের নৈতিক কর্তব্য, কিন্তু মানুষের জীবনের মতো শিল্পের জীবনও স্থাণু নয়। জীবনের মতো শিল্পও গতিশীল, ডোবার মতো বদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা তার বৈশিষ্ট্য নয়, নদীর মতো বৈচিত্র্য ও গতিশীলতাই হচ্ছে তার ধর্ম। শিল্পীর যে অহঙ্কার তা ঐ ধর্মকে পালন করে, তাকে অস্বীকার করে নয়। মানুষ কি চায়? মানুষ চায় তার জীবনের সত্যরূপ শিল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হোক। সামাজিক দুর্বলতা ও দোষত্রুটির অতিসচেতনতা এবং তাকে

নূতনভাবে ভেঙেচুরে গড়বার মতো অনুপ্রেরণা ও শক্তির অভাবের ফলে শিল্পীর সামনে নানারকম ভৌতিক কাল্পনিক জগতের আবির্ভাব হয়, যেখানে হয় তাঁরা কাপুরুষের মতো আশ্রয় নেন সংস্কারকের জাঁকালো মুখোস পরে, আর না-হয় এক বায়বীয় অবাস্তবতার আড়ালে নিজেদের অক্ষমতাকে গোপন করে রাখেন। মাতাল কবি ব্লক (Alexander Blok) তাঁর ক্লিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় অসন্তুষ্ট হয়ে শেষকালে সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন মদের গ্লাসের তলায়। নীরস ব্রুসভ্ (Brusov) পার্থিব বাস্তবতাকে এক বিরাট শূন্যতার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন

"I fashioned in deep meditation
A world in which nature was far,
Before which to a vast desolation
Plains, waters and mountain compare."

সমাজতন্ত্রবাদের সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে রাশিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ চাষীমজুরের দল আজ নবজীবন লাভ করেছে, আজ তাদের নৈতিক স্বাস্থ্য অনেক উন্নত, তাদের মানসিক শক্তি প্রচুর। আজ তারা দেখতে চায় শিল্পের মধ্যে তাদের নিজেদের জগৎকে, যে-জগৎকে তারা ঘাম আর রক্তের ভিত্তির উপর নিজেদের হাতে গড়ে তুলেছে। মাকড়সার মতো কবি বা শিল্পী কোনো ভৌতিক জগতের জাল বুনুক এ তারা কেউই চায় না।

চার্নিশেভ্স্কি (Chernishevsky) বলেছিলেন যে শিল্পের চেয়ে জীবন হল বৃহত্তর। এই কথা বলে তিনি শিল্পকে জীবনের কাছে খাটো করেননি। তাঁর উদ্দেশ্যই তা নয়। এই কথা বলে তিনি শুধু সৌন্দর্য-তাত্ত্বিকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তাদের কাল্পনিক লক্ষ্য অর্থহীন ও ভিত্তিহীন, শিল্পের প্রধান লক্ষ্য হল জীবন। জগতের শ্রমজীবীশ্রেণী (Proletariat), যারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম সর্বসাধারণের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার ভিত্তিভূমির উপর নিজেদের আদর্শানুরূপ জগৎ গড়ে তুলেছে, চাষীরা যারা সমষ্টিবাদের সহায়তায় গ্রাম্য নির্বুদ্ধিতা ও নিঃসঙ্গতাকে বর্জন করে সম্মিলিত জীবনের অমৃতাস্বাদ পেয়েছে, তারা সকলেই চায় যেন সাহিত্যের মধ্যে কর্মাবলী ও কর্মীবৃন্দের রূপ সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। ধনিকগোষ্ঠীর বা অভিজাত সম্প্রদায়ের ইমারতের কোণে সাহিত্যের যে রসদ সঞ্চিত ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে- আজ সাহিত্যের উপকরণ বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে

রয়েছে কারখানায়, শ্রমিকের গৃহ-কোণে, যন্ত্রের দানবীয় গর্জনে। স্ট্যালিন্ (Stalin) বলেন: "The people want literature to help them to root up the last remnant of the mentality of propertied individuals"—লোকে চায় প্রাচীনের যা কিছু ধ্বংসাবশেষ তাকে যেন লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ করা হয় সমসাময়িক সাহিত্যে বিদ্রূপ করে, তীক্ষ্ণ নির্মম ভাষায় উপহাস করে। তাদের সাহিত্যে থাকবে সাম্যবাদী জগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ তার পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সাম্যনীতির জয়গান। সে-সাহিত্যের রূপ কুৎসিত বা বিকৃত হবে না, শুধু অর্থহীন শব্দচাতুর্য তার বৈশিষ্ট্য হবে না। সে-সাহিত্য হবে সবল, সুষ্ঠু, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, সৎ সহজ ও সুন্দর।

এই সরলতার (simplicity) অর্থ সরলীকরণ (simplification) নয় বা আদিমতাও (Primitiveness) নয়। এর অর্থ জীবনের বর্ণহীন রেখাঙ্কনও নয়। রাশিয়ার জনগণ চায় দীপ্ত সরলতা, যে-সরলতার মধ্যে জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে, যে-সরলতার স্বচ্ছ সঙ্কেতে বিপ্লবের প্রত্যেকটি স্তর সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাহিত্যকে এই সরল পোশাক দিয়ে ভূষিত করা সহজ নয়। লেনিন্ ও স্ট্যালিন্-এর রচনা খুব সরল ও সুবোধ্য কারণ সেগুলি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সুন্দরতম বিকাশ, আর সেগুলি মুখ্যত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সহজভাবে পরিবেশন করবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সরলতা "artificiality" নয়, "buffoonery" নয় বা "muddleheadedness"-ও নয়। ফরম্যালিস্টরা content-কে ঘৃণা করেন এবং একটা 'involved form' প্রচার করেন। এই ফরম্যালিজ্‌ম্ সত্যবিরোধী, অর্থহীন ও মূল্যহীন। ঠিক তেমনি ন্যাচারালিজ্‌ম্‌ও জীবনের সত্য অর্থ প্রকাশের পথে ভীষণ অন্তরায়। তাহলে এই সরলতা কি? ভি. কিরপোটিনের (V. Kirpotin) ভাষায়

"It is not the accumulation of self-sufficient literary traditions or professional habits, but changes in the people's life that explain in the last resort the changes in the subject-matter, imagery and style of art"—এবং "Soviet Literature, the literature of socialist realism is a new literature, both in content and idea." সোভিয়েট সাহিত্য সোশ্যালিস্ট বাস্তবতার সাহিত্য, ভাবে ও ভাষায় এক সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্য, যার সঙ্গে চিরাচরিত রীতিনীতির

কোনো সম্বন্ধ নেই। সোভিয়েট সাহিত্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত মানবের অন্তরের অন্তরতম সত্যের সহজ ও সুন্দর অভিব্যক্তি, নিপীড়িত মানবতার নবজাগরণের, নবজীবনের বন্দনাগান। প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন ঐতিহ্যের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে আজ সে নূতন মানবজগৎ প্রতিষ্ঠার জয়যাত্রায় বেরিয়েছে।

আমরা যখন আধুনিক পাশ্চাত্য লেখকদের লেখা পড়ি তখন কতকগুলি বিষয় আমাদের চোখের সামনে অতি সহজেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। আমরা দেখতে পাই এইসব লেখকদের সর্বপ্রধান চিন্তা হচ্ছে মৃত্যুর বিভীষিকা আর নৈরাশ্যের অর্থহীনতা। মধ্যযুগে যখন মানুষ ভগবান বিশ্বাস করত সেই সময়ে এবং তার পরবর্তী যুগেও আমরা এই মৃত্যুর বিচিত্র কাব্যিকরূপ দেখতে পাই। পশ্চিমের আধুনিক শিল্পী ও সাহিত্যিকরা দেবতা বিশ্বাস করেন না, শুধু মৃত্যুচিন্তাতেই তাঁরা অধীর হয়ে উঠেছেন। মানুষের এই অবশ্যম্ভাবী বিরতির কথা স্মরণ করে তাঁরা জীবনের উপর কোনো মূল্যই আরোপ করতে চান না। একদল শিল্পী জগতের হারানো সৌন্দর্য ও সজীবতা ফিরিয়ে পাবার জন্য সকরুণ আর্তনাদ করেন, যেমন হেমিঙওয়ে (Earnest Hemingway) ও হপ্‌কিন্‌স্‌ (G. M. Hopkins), আর জেম্‌স্‌ জয়স্‌ (James Joyce) প্রমুখ একদল শিল্পী জোর করে স্বেচ্ছায় সৌন্দর্যের অস্তিত্বের সম্ভাব্যতাটুকুও ধ্বংস করতে চান। জয়স্‌-এর সুদীর্ঘ যান্ত্রিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত "undialectical" ও "unconstructive" এবং ফলে সাহিত্য না হয়ে গোটা জিনিসটা একটা ফিজিওলজি হয়, শুধু দৈহিক সম্বন্ধের ব্যাখ্যা ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার দুর্গন্ধ ভিন্ন আর কিছুই তাতে থাকে না। আমরা জানি এই মরণাতঙ্ক ও নৈরাশ্যবাদের একমাত্র কারণ মরণোন্মুখ প্রাচীন সমাজ। বুর্জোয়া য়ুরোপের তাই আজ সৃষ্টির ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, শিল্পী আজ পঙ্গু, তার ভাষা আজ নিস্তেজ, রঙ পাণ্ডুর, তার চিন্তাশক্তি আজ অবশ হয়ে এসেছে

And it seems to them that the death theme is the only theme for contemporary mankind. The artists of the West have no creative idea. They play about with form. Instead of Beethoven's mighty conversations with God, with destiny and with death, there is nothing left but bizarre combinations, disintegration of a fabric, interest in what is strange, occult, mad—(International Literature—No. 6, 1936).

জয়স্-এর এই স্যাচারালিজ্‌ম্ একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। জয়স্ লিখেছেন: "Cheese is the corpse of milk"—ক্ষীর হচ্ছে মৃতদুগ্ধ, অর্থাৎ দুধের মৃত্যু পর্যন্ত পাশ্চাত্য শিল্পীর কাছে সম্ভব। আজ পাশ্চাত্য শিল্পীর দৃষ্টিতে বুর্জোয়া য়্যুরোপের মৃত্যুমলিন ছায়াপাত হয়েছে, তাই আজ চারিদিকে শুধু মৃত্যুর কালিমা, জীবনের স্পন্দন যেন থেমে গিয়েছে। এই স্যাচারালিজ্‌ম্ বা 'formal conceits'-এ আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা চাই 'artistic' সত্য, 'dialectical' সত্য এবং সেই 'dialectical' সত্যানুসারে দুধ মায়ের বুক থেকে নিঃসৃত হয়ে শিশুর মুখের মধ্যে যায় এবং শিশু তাই পান করে সবল ও সুন্দর হয়ে জীবনধারণ করে। তাই আমাদের কাছে দুধ কোনোদিন মরে না।

পাশ্চাত্য শিল্পীর কথা থাক। সাহিত্যের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এবং বাস্তবতার গুণে সাহিত্যের ইতিহাসে ম্যাক্সিম্ গোর্কি (Maxim Gorki) যুগান্তর আনলেন রাশিয়ায়। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে নিজ্‌নির এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং চার বৎসর বয়সে চর্মকার পিতাকে হারিয়ে গোর্কিকে আশৈশব ভীষণ দুঃখদুর্দশার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাছাড়া মাঝে-মধ্যে রাজপুরুষদের হুমকিও খেতে হয়েছে অনেক, কিন্তু সে-সব গোর্কির জয়যাত্রার পথে শুধু ফুলই ছড়িয়েছে। তিনি সেই অকথ্য বিপর্যয়ের মাঝখানেও কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। আজীবন মনে রেখেছেন যে গ্রাসাচ্ছাদন, স্ফূর্তি, হল্লা, শিক্ষা, সংস্কৃতি শুধু ধনিক সম্প্রদায়ের করায়ত্ত হলেই যথেষ্ট নয়। সভ্যতার একমাত্র ব্রত হচ্ছে সর্বসাধারণের উৎকর্ষসাধনে, শ্রমজীবীদের সুখসম্পাদনে। তাই তাঁর জীবনে অনবদ্য শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে অকাতর সমাজসেবার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখতে পাই। শুধু সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নয়, সশস্ত্র রাজদ্রোহে পর্যন্ত সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়ে তিনি এই শ্রমজীবীদের অক্লান্ত সেবা করে গিয়েছেন। আইভান্ বুনিন্ (Ivan Bunin) প্রমুখ স্বদেশপলাতক লেখকদের মতো মাতৃভূমির কুৎসা প্রচারে তিনি উৎসাহ দেখাননি। গোর্কি কোনোদিন মনুষ্যধর্মের বাদ সাধেননি, সাধারণ স্বত্ব ব্যতীত ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণপরিণতি যে অসম্ভব তা বুঝতে পেরেই তিনি সাম্যবাদকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। গোর্কির হৃদয় অনেক বড়। তাঁর রচিত 'ফোমা গাডেইয়েভ', 'দি মাদার' প্রভৃতি উপন্যাসগুলির জীবনবেদ অসাধারণ—এদের চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত। প্রাদেশিক কুসংস্কারের সূচিভেদ্য অন্ধকারও যে স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় সূর্যকে চিরদিন

আবৃত করে রাখতে পারে না তা এরা সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। গোর্কির ছোট গল্পগুলি আরো চমৎকার, তাদের তুলনা হয় না। গোর্কির রসবোধ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দি বার্থ অফ এ ম্যান', 'টুয়েন্টিসিক্স্ মেন্ অ্যাণ্ড এ গার্ল', বিশেষ করে 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্' উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে তাঁর অসাধারণ রূপনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গোর্কির ভাষা চেখভ্ (Tchekoff) টুর্গেনিভ-এর মতো মাত্রাজ্ঞানসম্পন্ন স্থির, ধীর ভাষা নয়, টলস্টয়ের মতো গম্ভীর, শান্ত ভাষা নয়। গোর্কির ভাষা সিংহের গর্জনের মতো। 'ফোমা গাডেইয়েভ্-এর মুখবন্ধে হার্মান্ বার্নস্টাইন লিখেছেন

> In its elementary power is the heart-rending cry of a sincere but suffering soul that saw the brutality of life in all its horrors, and now flings its experiences into the face of the world with unequalled sympathy and the courage of a giant.

রাশিয়ার আধুনিক তরুণ লেখকদের মধ্যে মিখেইল্ শোলোখভ্-এর (Mikhail Sholokhov) নাম সকলের কাছে পরিচিত। তাঁর 'And Quiet Flows The Don' বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস এবং তারপরে 'Virgin Soil Upturned'। শোলোখভ্-এর রচনা যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর। তাঁর চরিত্রগুলি জটিল হলেও সেগুলি এমন সুকৌশলে চিত্রিত করা হয়েছে যে তারা সকলেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যিকদের মধ্যে এত সজীব করে, এতো হুঁসিয়ার হয়ে চরিত্র সৃষ্টি করতে আর কাউকে দেখা যায় না। শোলোখভ্-এর বর্ণনার ক্ষমতাও অসীম। এই ক্ষমতার পরিচয় দেবার জন্য আমি 'And Quite Flows The Don' থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি

> "Grigori half turned to the company :
> "Sabres out ! Charge ! After me, boys ! Lightly grasping his sabre he was the first to cry : 'Hurraaaah' ! and experiencing a familiar, shivering lightness in his whole body, he let his horse go, the reins firmly grasped in his left hand, trembled, the blade lifted above his head whistlingly cut the current of the onrushing breeze.
>
> "A huge white cloud that the spring wind had rolled up covered the sun for a minute and, overtaking Grigori, cast

a see mingly slow-moving grey shade upon the hillock. Grigori shifted his glance from the nearing houses of Klimovka to this shadow which was slipping over the still mcist soil of the hillock, to the brightly golden, joyful strip of light which was flying away somewhere ahead. Suddenly he had an inexplicable and unreasoning desire to overtake the light that was running over the earth. Spurring on his horse, Grigori let it go at full speed and began to come close to the uncertain boundary separating light from shade. A few seconds of desperate riding and then outstretched head of the horse was scattered with seed of flaming beams, its reddish hair suddenly flared out with a fierce, shooting brilliance. At the moment when Grigori leaped over the imperceptible margin of the cloudy shade shots slowly rang out from the lane.

এত বড় একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত করবার কারণ হচ্ছে এইটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে শোলোখভ্-এর চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাবর্ণনের ক্ষমতা যে কতখানি এবং সেগুলি যত সজীব ও স্বাভাবিক তা বুঝতে কষ্ট হবে না। সাধারণ মানুষ, চাষামজুর ও কস্থাকদের দৈনন্দিন জীবনের গতিবিধি, তাদের অনুভূতি, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শোলোখভ্ সুপরিচিত। যে অনুপ্রেরণায় ও যে অনুভূতিতে তিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে পরিচালনা করেন, সেগুলি জটিল হলেও ঘটনার সঙ্গে তারা সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে গ্রথিত এবং মূল গল্পের স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে তারা কোথাও বাধা দেয়নি। শোলোখভ্ বস্তুবাদী, তাই পাঠককে পরিশ্রম করে অনুমান করে নিতে হয় না কেন গ্রিগরি মেঘের ছায়া অনুসরণ করেছিল, কেন সে মাঠের উপর আছড়ে পড়েছিল। পাঠক সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারেন। জটিলতার বিশাল পটভূমিকায় বিচিত্র ভাব ও ঘটনার রঙে শোলোখভ্-এর চরিত্রগুলি চিত্রিত হলেও, তাঁর ঘটনাগ্রন্থন কোথাও শিথিল হয়নি। তাঁর ঘটনাগ্রন্থন সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত। শোলোখভ্-এর আরএকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘটনার তীব্রতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ভাষার ও বর্ণনার আনুপাতিক সংযম। কস্থাকরা যখন ক্যাম্পে চলেছে তখন পথের উপর তাদের সরল সুন্দর গ্রাম্য গীতি, ঠাট্টা বিদ্রূপ, হল্লা, তর্ক, কথাবার্তার এক সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন শোলোখভ, কিন্তু যে-ঘটনাগুলি ভীষণ চাঞ্চল্যকর

সেগুলি অত্যন্ত সংক্ষেপে বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, যেমন অ্যাক-সিনিয়ার রেপ এবং ঐ জাতীয় আরো অনেকগুলি ঘটনা। এই সংযমের ফলে এই সুদীর্ঘ বইখানির সৌন্দর্যের অঙ্গহানি হয়নি কোথাও।

আধুনিক সোভিয়েট লেখকদের আনন্দের একমাত্র কারণ হচ্ছে যে তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সর্বসাধারণের জন্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের আন্তরিক পরিতৃপ্তি ও নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য। তাঁদের সাহিত্যের বাণী হচ্ছে জনগণের কল্যাণ। তাঁরা এক নূতন জগতের স্রষ্টা হিসেবে মানুষের কাছে এসেছেন, যে-জগতে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শোষণ করে গলগণ্ডের মতো ফাঁপে না, যেখানে শাস্ত্রসম্মত নৈতিকতার আড়ালে লাম্পট্য নেই, যেখানে স্বাধীনতায় সকলের সমান অধিকার, যেখানে জীবনধারণের প্রত্যেকটি উপায়ের উপর সকলের সমান দাবি, যেখানে জাতির ভাগ্যবিধাতারা তথাকথিত মঙ্গলাচরণের হুমকি দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার বিলাসিতায় ডোবে না, যেখানে মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিনিময়ে প্রাণ বলি দেওয়া মানুষের ধর্ম। যুগে যুগে মানুষের পারিপার্শ্বিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যেরও রূপ বদলায়। যে-সত্য নির্বিকার, যে-সত্যের কালের কাছে অপরিবর্তনীয়তার অর্ঘ্য দাবি করবার মতো ধৃষ্টতা আছে, সে-সত্য--সত্য কখনো নয়, বিরাট মিথ্যা। আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সত্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ, ধনতান্ত্রিক শোষকশ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী বিনাশ, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য হচ্ছে সেই সাম্যবাদী সমাজের সৌন্দর্য সেখানে শুধু দেবতার ও রাজার মুষ্টিমেয় প্রিয়জনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধিব্যবস্থা নেই, সর্বসাধারণের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারলাভের সুবন্দোবস্ত আছে। আর বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম কল্যাণের বাইরে শিবের কোনো পরিচয় নেই। তাই সোভিয়েট শিল্পই সত্য, শিব ও সুন্দরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং সোভিয়েট সাহিত্য বিশ্ববরেণ্য।

নবম অধ্যায়

বিজ্ঞান মানুষ ও সমাজ

বিজ্ঞান মানুষের প্রয়াস। যেদিন জন্ম নিল সমাজ, সেদিন বিজ্ঞানও জন্ম নিল। বিজ্ঞানের সমাপ্তি নেই, কারণ মানবতার আয়ু অফুরন্ত। যুগের মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির রহস্যের অবগুণ্ঠন অনাবৃত করে হয় যুগান্তকারী। যুগের পর যুগ মানুষ এইভাবে এগিয়ে চলেছে, চলছে, চলবে। নিত্য নব সমস্যার আবির্ভাবের সঙ্গে নূতনতর প্রতিভার উন্মেষ, শক্তির প্রকাশ, সমস্যার আর শক্তিতে সংগ্রাম, সমস্যার প্রতিভূ প্রকৃতির পরাজয় আর শক্তির প্রতিভূ মানুষের জয়,—এই হল মানুষের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস, সুতরাং বিজ্ঞানের ইতিহাস। গ্রাম্যগীতি গেয়ে লাঙল আর গরু নিয়ে আমরা আজ তাই ক্ষেত চষি না, আজ গেসোলিনে ট্র্যাক্টর চলে মাটির বুকে। তীরধনুক নিয়ে বল্কল পরে বনেজঙ্গলে আমরা আজ পশুশিকার করি না, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যন্ত্রে আমাদের খাবার তৈরি হয়, হাজার জনের খাবার কয়েক মিনিটে। গুহা ছেড়ে আজ যেখানে আমরা বাস করি তার স্বচ্ছ সরল আভিজাত্যে বিশ্বকর্মাকে মাথা হেঁট করতে হবে। যন্ত্রে কাজ করে, আমরা পরিদর্শন করি। আমাদের এই যে কাহিনী, এই তো মানুষের ইতিহাস, মানুষের আর বিজ্ঞানের। অথচ নিখিলের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবীর আয়তন, আর পৃথিবীর তুলনায় আমাদের সত্তার স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবতেও আমরা হতবাক্ হয়ে যাই। হবারই কথা। কয়েকটি মাত্র নক্ষত্রের বিষয় আমরা জানি, এ-পৃথিবীর চেয়ে সেগুলি সামান্য বড়, কিন্তু অধিক সংখ্যক নক্ষত্র এতো বড়ো যে এ-পৃথিবীর মতো লক্ষ পৃথিবীকে তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে স্থান দিয়েও পূরণ হয় না, এবং এই শ্রেণীর নক্ষত্রের সংখ্যা এ-পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র-কূলের বালুকাসমষ্টির সমান। আমাদের আবাসগৃহ এ-পৃথিবীর সামান্যতা সহজেই অনুমেয়, আর আমাদের অর্থাৎ মানুষের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতাও সহজবোধ্য। সেজন্য নিখিলের অধীশ্বর দেবতার সম্মুখে শ্রদ্ধানত শিরে এ-পৃথিবীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মানুষ অপরাধীর মতো তার নগণ্যতার জন্য সঙ্কুচিত হবে না, বলবে না এ-যুগের বৈজ্ঞানিক জীন্‌স্-এর মতো যে এই নিখিলের শিল্পী হচ্ছেন একজন খাঁটি গণিতশাস্ত্রবিদ্, তিনশো বছর

আগে কেপ্‌লার যা বলে গিয়েছিলেন—এ-পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টির আঙ্গিক ঐক্যের ও পরিপূর্ণতার প্রতীক—বলবে না এ যুগের কবি এলিয়ট্‌-এর মতো যে এ-পৃথিবীর মুখে আঁধারের ছায়া নামে, এ-পৃথিবী শূন্য ও অর্থহীন, বলবে না এ-যুগের রাজনীতিকদের মতো 'ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!' শান্তি নেই, সংগ্রাম আছে, আর সংগ্রামের জয়ে আছে সম্যাবস্থা। বিশ্রাম নেই, গতি আছে, দ্বন্দ্বমুখর গতি, বিকাশ যার সমন্বিত সভ্যতায়, পুনরায় আবর্তনের আঘাতে যা দ্বিধাবিভক্ত ও গতিশীল। এই তো মানুষের কাহিনী, সমাজ ও সভ্যতার ক্রমাবর্তন, বিজ্ঞানের ইতিকথা।

আরিস্ততল্‌ থেকে স্কলাস্টিক্‌ দর্শন অ্যাক্যুইনাস, রোজার ও ফ্রান্সিস্‌ বেকন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিসদৃশ সমাবেশ আমরা লক্ষ্য করলাম। বিজ্ঞানের বিস্তৃতি ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে লাগল এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের পারস্পরিক বিরোধ হয়ে উঠল তীব্রতর। দর্শনের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণই হচ্ছিল, কারণ মর্ত্যলোকের প্রতিবেশে তখন তার বিরক্তির ভাব স্ফুটতর, অমর্ত্যলোকে দেবতার পরিপার্শ্বে তার পরিতৃপ্তি। তারপর এল মধ্যযুগের বিজ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের পারিপাট্য নিয়ে। সে-যুগের 'ক্ষ্যাপা' বৈজ্ঞানিকেরা হল 'পরশ পাথরে'র সন্ধানে উন্মাদ। নিকৃষ্ট ধাতুকে কেমনভাবে সোনাতে রূপান্তরিত করা যাবে তারই সাধনায় তাঁরা মগ্ন হলেন। অধ্যাত্ম-লোকের প্রহরীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, খোদার উপর খোদগারীকে তাঁদের কাছে বৈজ্ঞানিকের অমার্জনীয় ধৃষ্টতা বলে মনে হল। তারপর এল রেনেসাঁস্‌-এর যুগ। কয়েকটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হল এবং বৈজ্ঞানিকও তাঁর অলীক সাধনমার্গ ছেড়ে বীক্ষণাগারে নিজের অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। কক্ষঅবরুদ্ধ আত্মিক উল্লাস বর্জন করে দার্শনিকও বাইরের মুক্ত আলো বাতাসের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। দুয়ের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই ঘনীভূত হতে লাগল। নব নব শতাব্দীতে নব নব আবিষ্কৃত যন্ত্রের ভিড় জমতে লাগল। পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রের বিস্তার গেল আশাতীতভাবে বেড়ে। তথ্যের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি দৃঢ়তর হতে লাগল। অভিজাত কল্পনার বংশজাত দার্শনিক মুষ্‌ড়ে পড়লেন। পৃথিবী-সম্পর্কিত আদি অন্ত সমস্যার, অতীন্দ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিকতার সম্মোহিত 'চম্পা'র দেশ থেকে দ্বীপান্তরিত হয়ে বিজ্ঞান ফিরে এল ভূমিতে, পর্যবেক্ষণবাদের (Empiricism) প্রাসাদ ধসে পড়ার শব্দ শোনা গেল। মানুষের মননশক্তি পর্যবেক্ষণের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে

বন্দী হয়ে মুক্ত জীবনাস্বাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। আজ তাই বৈজ্ঞানিকের মনে সংশয় জেগেছে বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট আসন নিয়ে। সৌরজগৎকে কেন্দ্র করে যে বিশাল প্রশ্নসমষ্টি, অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে সংখ্যাতীত নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে যে অনন্ত অনুসন্ধিৎসার ধূম্রকুণ্ডলী তাকে মানুষিক বুদ্ধি দিয়ে অপসারিত করবার দাবির মধ্যে বিজ্ঞানের দান কি—তাই নিয়ে বৈজ্ঞানিকের আজ বিপুল চিন্তা। বীক্ষণাগারের সূচীশ্রান্ত জীবনের ক্লিষ্ট আবহাওয়া তাঁদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। পারিপার্শ্বিকতার মূল্য নির্ধারণের যে হুকুম জারি হয়েছে তাতে তাঁরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। প্ল্যাঙ্ক্ (Planck), জীন্স্ (Jeans), এডিংটন্ (Eddington), হোয়াইট্‌হেড্ (Whitehead), লজ্ (Lodge), হ্যাল্‌ডেন্ (Haldane) প্রভৃতি এই ব্যাকুলতার প্রতীক। সরীসৃপের মতো বিবেক আজ বৈজ্ঞানিকের মন বেষ্টন করে নিষ্পেষণ করছে। বৈজ্ঞানিকের মধ্যে আজ দংশনোদ্যত বিবেক। সম্মুখে বিরাট প্রশ্ন—"?"

বিজ্ঞানের দুটি দিক আছে এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষার যোগ্য। একটিতে বৈজ্ঞানিকের স্বার্থ ব্যক্তি হিসাবে, অপরটিতে সমাজের সভ্য হিসাবে। একটিতে প্রকৃতির শক্তিগুলির অধ্যয়ন, পরীক্ষার ও বিশ্লেষণের নব পদ্ধতি আবিষ্কার এবং অধীত (Theoretical) ও ফলিতের (Practical) মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করে সর্বসাধারণের সম্মতিলাভ। অপরটির মধ্যে বিজ্ঞানের সামাজিক বিকাশের স্বীকৃতি আছে, সুতরাং সেই অনুপাতে তার ব্যাখ্যানও আবশ্যক। প্রথমটির উদ্দেশ্য নৈতিক বা ব্যক্তিক সংস্কার থেকে অধ্যয়নবস্তুর নির্মুক্তি কামনা হলেও দ্বিতীয়টির এর কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই। সমাজে যতদিন নীতিগত ও সমাজগত স্তরবিন্যাস (Ideological and Social Stratification) থাকবে, ততদিন প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্লীন ঐতিহ্যের প্রভাবদুষ্ট বিজ্ঞান হবেই। বিজ্ঞানের এই দুটি দিকের একটি বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যাপার, অর্থাৎ তার 'isolate'-দের সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত; অপরটি তার বাহ্যিক সম্বন্ধের, অর্থাৎ সমাজের বিন্যস্ত শ্রেণীগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে তার সম্বন্ধের ব্যাপার, যেখানে 'isolate' সে নিজেই। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম দিকটিতেই বিজ্ঞানের প্রগতি সম্ভব হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা ও যাদুবিদ্যা থেকে শুরু করে ঐতিহ্য, ব্যবহার ও ব্যক্তি-সর্বস্বতার ভিতর দিয়ে—বিজ্ঞান যত

থাটি পরীক্ষার দিকে অগ্রসর হয়েছে, তত অভিজ্ঞতা-স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের জন্য নির্দিষ্ট 'criteria' আবির্ভূত হয়েছে। নিজেদের কর্মফলের মধ্যে বৈজ্ঞানিকদের একতা দৃষ্ট হলেও তাঁরা কিন্তু এক অদ্ভুত প্রহেলিকার পরিচয় দেন। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের 'internal function' এবং তার সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের এই মতবিরোধ প্রণিধানযোগ্য।

অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেড্‌ বলেছেন: "Our problem is to fit the world to our perceptions and not perceptions to the world". এখানে হোয়াইট্‌হেড্‌ আদর্শবাদী। তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যা তাই তাঁর কাছে প্রধান সত্য এবং পৃথিবীকে তিনি তার মধ্যে জুড়তে চান। হোয়াইট্‌হেড-এর কাছে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন হচ্ছে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার (Sense perception) বিশ্লেষণ। আর্থার এডিংটন্‌ (Arthur Eddington) বলেন: "Science aims at constructing a world that shall be *Symbolic* of the world of commonplace experience". এ-মতেরও তাঁর সঙ্গতি নেই। তিনি তাঁর "Nature of the Physical World" আরম্ভ করেছেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত টেব্‌লের সঙ্গে (Whitehead-এর ভাষায় 'Common-sense notion' টেব্‌ল) বৈজ্ঞানিক টেবলের পার্থক্য দেখিয়ে। তাঁর দৈনন্দিন টেব্‌লে তিনি লেখেন, পড়েন, কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক টেব্‌লের বিশাল শূন্যতার মধ্যে অসংখ্য পরমাণু বিদ্যুৎবেগে ছুটোছুটি করছে এবং যার "combined bulk amounts to less than a milionth part of the *table itself*." তাঁর মতামতের অসঙ্গতি তখনই পরিলক্ষিত হয় যখন তিনি পরে বলেন: "Modern physics has by delicate test and remorseless logic assured me that my second scientific table is the only one that is *really* there"—এবং এই সমস্ত সূক্ষ্ম পরীক্ষা যা তাঁর বৈজ্ঞানিক টেব্‌লের 'তত্রত্ব' (Thereness) প্রমাণ করছে অথচ দৈনন্দিন টেব্‌লের 'তত্রত্বে' বিশ্বাস করছে না, তাদের তিনি কোনো উল্লেখই করেন না। আমাদের যতদূর মনে হয় বৈজ্ঞানিকের এই প্রকার কোনো 'সূক্ষ্ম পরীক্ষার' সুযোগ নেই। এই অবস্থায় "রূপক" (Symbolic) বৈজ্ঞানিক টেব্‌লকে দৈনন্দিন টেব্‌ল অপেক্ষা বেশি 'বাস্তব' ভাবার মধ্যে মনের যে অদ্ভুত কল্পনা-ক্রীড়া আছে তাতে আমাদের চিত্ত আদৌ সাড়া দেয় না। বারট্রাণ্ড রাসেল

(Bertrand Russel) বলেছেন যে চেতন বা অচেতনভাবেই হোক, পদার্থ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর কারণ-কাঠামো (Causal Skeleton) আবিষ্কার করা। অন্যত্র তাঁর "The Analysis of Matter" নামক পুস্তকের মধ্যে তিনি বলেছেন: "It is obvious that a man who can see, knows things that a blind man cannot know; but a blind man can know the whole of physics. Thus the knowledge that other men have and he has not is not part of physics". এ-প্রশ্ন অবশ্যই অর্থহীন যে সমস্ত বিজ্ঞান বোঝা কোনো ব্যক্তির পক্ষে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সম্ভব কিনা। প্রশ্ন হতে পারে, তার জন্য কি কি ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা আছে। যদি কোনো ব্যক্তির কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগের জন্য, তাহলে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপরটির পার্থক্য কিভাবে বিচার করব? রাসেল্-এর বক্তব্য হচ্ছে যে দৃশ্যমান জগৎ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রতিচ্ছবির এককীকরণ (isolation) সম্ভব, তাতে কিছুই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। অধ্যাপক লেভী (H. Levy) বলেছেন: "This is surely an unsubstantiated assertion"—সূর্যের বর্ণালীর (Spectrum) মধ্যে একটি আইন আছে যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ১৫৯,০০০,০০০, সেন্টিমিটার, এ-কথা বললে অন্ধে যা বুঝবে তা শুধু ঐ সংখ্যা ও পরিমাপ। কিন্তু এই বোঝার সঙ্গে ঐ বর্ণালীর কমলারঙের (Orange) অংশটুকু যে ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটি লাইনদ্বারা অতিক্রান্ত, এ-বোঝার অনেক পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় কথার মধ্যে পৃথিবীর যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে তা অপরটিতে উপেক্ষিত হচ্ছে এবং এই দুই বোধের মধ্যে ব্যবধান আকাশ-মাটি। রাসেলের বক্তব্য সেইজন্যই গ্রহণীয় নয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও লেখকদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই সব হচ্ছে মতামত। এর মূল কারণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বৈজ্ঞানিকের অচলায়তনে পূর্বদিকের কপাট আজ উন্মুক্ত। অধীত (Theoretical) বিজ্ঞান তার সীমান্তে এসে ভাবছে "অতঃপর"? ফলিত (Practical) বিজ্ঞানের এসেছে বিবেক-বৃশ্চিক দংশন। বাইরে যে-সমাজ, মানবগোষ্ঠীর যে বৃহৎ সমাজ, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কি, আত্মীয়তা কিছু আছে কিনা এবং তা কি রকমের? বাইরের সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ-নির্ণয় করবার আহ্বান আজ বীক্ষণাগারের প্রশান্ত প্রতিবেশকে চঞ্চল করেছে। সামাজিক পটভূমির উপর নিজেকে প্রক্ষিপ্ত

না করে আজ আর বৈজ্ঞানিকের স্বস্তি নেই। কিছুদিন পূর্বে ব্ল্যাকপুলে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকদের এক সভায় এই সম্বন্ধ-নির্ণয়ের যে প্রচেষ্টা হয়েছিল তাতে শুধু বোঝা গিয়েছিল যে বিজ্ঞানের প্রগতি সম্ভব হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনকে স্বীকার করে। সমাজজীবনের ভাবস্রোত বিজ্ঞানের পথ কেটে চলেছে সামনে এবং বিজ্ঞানের রূপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দেশ, কাল ও পাত্র সাপেক্ষ বস্তুর সমাবেশে। নিউটন্, ফ্যারাডে, ম্যাক্স্ওয়েল্, পাস্তর, প্যাভ্লভ্, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা না করলেও, এ-কথা অস্বীকার্য নয় যে সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সমাজনীতি অথবা মানুষের ব্যবহারিক জগৎ এঁদের চিন্তাধারা ও কর্মধারাকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছে। মানবকল্যাণের শুভেচ্ছাতেই চিরদিন বৈজ্ঞানিকের অন্তর অনুরণিত। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যে মধ্যযুগীয় কল্পনা-বিলাসিতার পুনরাবির্ভাব হয়েছে তার কারণ বর্তমান সমাজ ও ভাবী সমাজ উভয় সম্পর্কেই তাঁদের নৈরাশ্য ও পরাভব-মনোবৃত্তি। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে বড় সত্য হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান সমাজজীবনের ফল, এবং সমাজজীবনের কল্যাণসাধনই বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

আজ লজ্ বলছেন (Oliver Lodge): "There is evidence of mind at work, beneficient and contriving mind, actuated by purpose ..."—জীন্স্ বলছেন: "The universe begins to look more like a great thought than a great machine. The universe can be best pictured as consisting of pure thought of a mathematical thinker…,'—বার্গসঁ (Bergson) বলছেন "Elan Vital" জীবনকে "more and more complex forms"-এর ভিতর দিয়ে "higher and higher *destinies*"-এতে নিয়ে যায়। এ-সবের অর্থ কি? এঁরা এবং এঁদের অনুচরবৃন্দ বলবেন এই তো বিজ্ঞান, প্রজ্ঞানের সঙ্গে যার অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা, 'বিশ্বেশ্বর' যার সর্বময় প্রভু। এখানে আবার বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের প্রশ্ন আসে। এঁরা হচ্ছেন ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি। সীমাহীন নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে এঁরা দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে বিপজ্জনক ভাসমান আইস্‌বার্গকে আঁকড়ে ধরতে চান। তাই আজ পৃথিবীর পশ্চাতে 'নিগূঢ় নিয়তি'র (Purpose) ব্যাখ্যা চলছে, পৃথিবী আজ তাই মনোহর অলস ভাবের (Thought) পর্যায়ে, এবং 'Elan Vital', 'Supra-Conscious' প্রভৃতির অবতারণা। আজ তাই ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজের

ক্ষয়িষ্ণু দুর্গন্ধি কলেবরের দিকে চেয়ে কবি T. S Eliot বিলাপ করেছেন "Waste and Void. Waste and Void." আর বৈজ্ঞানিক প্রাচীন প্রফেট্ ও পয়গম্বরের শূন্যাসনে বসে ইষ্টনাম জপ করছেন। কিন্তু যেখানে এই মৃত্যুযন্ত্রণা নেই, এই নৈরাশ্য নেই, যেখানে সমাজের পচা-গলা আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, সেই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট্ য়্যুনিয়ন্-এর বোল্‌শেভিক্‌দের আদর্শ হচ্ছে: "No one can be a member of the party or even a probationary .... who does not wholeheartedly and outspokenly declare himself an atheist, and a complete denier of the existence of every form or kind of the supernatural." বোল্‌শেভিক্ রাশিয়ার বিজ্ঞান আজ আস্তিক্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন না হয়ে, কল্পলোকের পরমেশ্বরের শরণাপন্ন না হয়ে, নাস্তিক্যগন্ধী বিজ্ঞান হয়েছে, কারণ সেখানে শ্রেণী-শাসন বা শ্রেণী-শোষণ নেই, ক্ষয়িষ্ণু সমাজগর্ভজাত অবসাদের সোঁদা গন্ধ নেই, বর্ধিষ্ণু সমাজতান্ত্রিক সমাজের অপূর্ব লাবণ্য আছে। সেখানকার বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সত্য মানুষ ও সমাজ, তার উপরে কোনো কিছুর অস্তিত্বে আস্থা নেই। সেখানকার বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য তাই প্রাচুর্য ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী, তার মধ্যে বৈরীভাব বা তস্করপ্রবৃত্তির আবিলস্পর্শ নেই। সমাজ যেদিন শ্রেণীমুক্ত হবে, অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ যেদিন বিলুপ্ত হবে, সেদিন বিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে তার আদর্শের জয়গান গেয়ে মানুষকে নিঃসঙ্কোচে আহ্বান করবে। তাই বৈজ্ঞানিকের নিরাশায় আমরা বিজ্ঞানের উপর শ্রদ্ধা বা আশা ত্যাগ করিনি। বিজ্ঞান চিরদিনই মানুষের সামনে শঙ্খধ্বনি করে এগিয়ে যাবে, সমতলে অনুগামী হবে মানুষ ও মানুষের সমাজ। বৈজ্ঞানিক চিরদিন মানুষের নমস্য থাকবেন সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে

দশম অধ্যায়

সংস্কৃতি-সঙ্কটের রূপ

—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী! দয়াহীন সভ্যতা-নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে,
গুপ্ত বিষদন্ত তা'র ভরি' তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম;—প্রলয়-মোন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হ'তে। লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়,
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

—রবীন্দ্রনাথ—শতাব্দীর সূর্যাস্ত

এই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার রূপ। নাগিনীর মতো কুটিল ফণা তুলে বুর্জোয়াসভ্যতা আজ দংশনোদ্যত। চারিদিকে চলেছে স্বার্থে স্বার্থে, লোভে লোভে সংঘাত। বর্বরতা ভদ্রতার মুখোস পরে প্রভুত্ব করছে। জাতিপ্রেমের অন্তরালে মুষ্টিমেয় রাজ্যলোভাতুরের অন্যায় আত্মগোপন করে আছে। হিংসার এই নরমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে অস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যে, বোমা-বিস্ফোরণ ও কামান-গর্জনের মধ্যে। মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের নহবতের ঐকতান আজ আর শোনা যায় না। কবিও তাই আজ শ্মশান-কুকুরের মতো শব-কাড়াকাড়ির চিৎকার করছেন। চারিদিকে শুধু কাঁপা মানুষ প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর মুমূর্ষু পৃথিবীর কাতরানি নেড়ী কুকুরের নাকীকান্নার মতো কবির কানে ভেসে আসছে। তাতেও স্বস্তি নেই। উদ্ধত কণ্ঠে কেউ ঘোষণা করছেন যে জীবন, মৃত্যু, সভ্যতা, বর্বরতা চক্রবৎ ঘুরে ঘুরে আসে। শিল্প, সভ্যতা

ও সস্কৃতির সঙ্গে মানুষের চিরস্থায়ী যোগাযোগ নেই। অনেকদিন সভ্যতাকে মানুষ উপভোগ করেছে, আজ তাই বর্বরতার যুগে ফিরে যেতেই হবে। বর্বরতাই মানুষের মুক্তির পথ।

হঠাৎ মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মানুষের এই বৈরাগ্যের কারণ কি? যে-সভ্যতার এক একটি স্তম্ভ মানুষ যুগে যুগে নিজের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি ব্যয় করে তৈরি করেছে, তাকে আজ কেন সেই মানুষই অট্টহাস্যে তাসের ঘরের মতো ধূলিসাৎ করে দিয়ে শান্তি পেতে চায়? এতদিন মানুষের কণ্ঠ থেকে বেঁচে থাকার যে রুদ্র সুর ধ্বনিত হয়েছে, আজ কেন সেখান থেকে মৃত্যুর করুণ রাগিণী, নীড়হারা পাখির বিলাপের মতো উৎসারিত হচ্ছে। আজ জীবন মিথ্যা, সভ্যতা মিথ্যা, শিল্প মিথ্যা, সংস্কৃতি মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, সত্য শুধু মৃত্যু, সত্য শুধু অন্যায়, অবিচার, গর্বোদ্ধত স্বেচ্ছাচারিতা, পাশবিকতা। কেন? ধনতান্ত্রিক সভ্যতা নিজের গড়া শৃঙ্খলে নিজে আবদ্ধ হয়ে মহাযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের অগ্নিকুণ্ডে মানুষকে নিক্ষেপ করে ভস্মীভূত করেছে। মানুষকে আজ তাই প্রাণহীন, ফাঁপা মনে হয়।

"……মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিল। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেনি। তারা আসত কালো আঁধির মতো ধূলায় আপনাকে আবৃত করে, কিন্তু এ এসেছে যেন আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়স্রাব, অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত উৎস উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে, দগ্ধ করে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্যামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা করে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্ধত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে; …আজকাল দেখছি আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্চে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্চে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে"। (রবীন্দ্রনাথ—কালান্তর)

যখন যুদ্ধক্ষেত্রে চারিদিকে বিকলাঙ্গ মানুষের মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েছে তখন মনোরাজ্যেও যে অনুরূপ বীভৎসতার সৃষ্টি হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। নরমুণ্ডের স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের অপব্যবহার ও তার শোচনীয় পরিণামের কথা স্মরণ করে বৈজ্ঞানিকের মন আর বীক্ষণাগারের দিকে না ঝুঁকে

দিব্যজ্যোতির সন্ধানে রহস্যাবৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে ঘুরে বেড়াবে, এ তো খুব স্বাভাবিক। স্বাধীনতা ও মানবতার বন্দনাগান গেয়ে গেয়ে যে-শিল্পীর কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি এসেছে, সে-স্বাধীনতা ও মানবতার রূপ যখন নির্মম পাশবিকতা ও হিংস্রতার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে, তখন সে-শিল্পীর পক্ষে নৈরাশ্য, অবসাদ ও মৃত্যুর প্রশস্তি গাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যে-য়ুরোপ একদিন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড়াই করেছে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির কাছে, এবং সত্যই যে-য়ুরোপের একদিন উদ্দেশ্য ছিল সভ্যতার মশাল জ্বেলে মানুষের চলার পথ আলোকিত করা, আজ তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যখন ফ্যাশিজম্-এর নির্বিচার অমানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে, মানুষের, সভ্যতার, সংস্কৃতির উচ্চাদর্শকে অশ্রদ্ধা করে নির্লজ্জ রাহাজানির ইন্ধন যোগানো হচ্ছে, যখন শিল্পীকে বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে, তখন মানুষ আতঙ্কে অবিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরতে যাবে। মানুষের মন চেতনার রাজসিংহাসন থেকে বিচ্যুত হয়ে অবচেতনার অন্ধকার প্রেতপুরীর মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। সেই ভয়ঙ্কর আদিম অন্ধকার বন্যজন্তুর মতো আরণ্যক হিংস্রতায় যখন মানুষের দিকে লকলকে জিব বার করে চেয়ে থাকে, তখন মানুষের কণ্ঠ থেকে অসহায় মৃত্যুর যন্ত্রণা ও আর্তনাদ ভিন্ন অন্য কি শুনবার প্রত্যাশা আমরা করতে পারি? 'জয়, বর্বরতার জয়!' 'জয়, নরহত্যার জয়!' 'জয়, কৃতঘ্নতার জয়!' 'স্বেচ্ছাচার দীর্ঘজীবী হোক্!'—চারিদিকে যখন এই মন্ত্র উচ্চারিত হয় তখন জীবন বা সভ্যতা অর্থহীন হয়ে যায়, মানুষ মিথ্যা হয়ে যায়, সত্য হয় শুধু মৃত্যু, আর উচ্ছৃঙ্খল পাশবিকতার অবসাদ। মনেহয় মানুষের সভ্যতা আজ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই আগুন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে সবকিছু আত্মসাৎ করে নিচ্ছে, কোনো কিছুরই শেষচিহ্নটুকু পর্যন্ত থাকবে না। মানুষের মঙ্গলসাধনের যে-ব্রত নিয়ে বিজ্ঞান সভ্যতার জন্মদিনে জয়যাত্রা করেছিল, সে-ব্রত আজ মানবজাতির অকল্যাণকর স্তোত্রপাঠে পরিণত হয়েছে, মানুষের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্যকে বিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞান আজ হয়েছে বারবনিতার মতো ধনতান্ত্রিক সমাজ-রক্ষকদের রক্ষিতা, এবং শিল্পেরও সেই একই শোচনীয় পরিণাম। বহির্জগতের বিরাট ওলটপালটের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর এই মানসিক বিপর্যয়, সংস্কৃতি-সঙ্কটের রূপোপলব্ধির জন্য তাই বিশেষভাবে প্রণিধেয়।

মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করবার জন্য যে-বিজ্ঞান সর্বাপেক্ষা বেশি দায়ী প্রথমে সেই মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। যে-বিজ্ঞান বহির্জগতের

প্রতি মানুষের উদাসীনতার ইন্ধন যুগিয়েছে, আর মানুষকে তার প্রত্যক্ষ প্রতিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্তরাভিমুখী করেছে, মৃত্যুকে দিয়েছে জীবনের চাইতে বেশি সম্মান, তার সর্বপ্রধান নায়ক হলেন সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড্ (Sigmund Freud)। ফ্রয়েড্ মনোবিজ্ঞানের সাধনা করে মানুষের সংস্কৃতিসম্ভার যে অনেক বাড়িয়েছেন তাতে কারো এতটুকুও সন্দেহ নেই। সাংস্কৃতিক দানের মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর গর্বের বিষয়। কিন্তু বুর্জোয়া অধ্যাসের মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ফ্রয়েডীয় প্রতিভা মানুষের ততখানি কল্যাণ করেনি, যতখানি তার করা উচিত ছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ফ্রয়েডীয় প্রতিভা বন্দী হয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবু মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, মানুষের কামনা, বাসনা প্রভৃতি চরিতার্থতার জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষের যে অক্লান্ত প্রয়াস, বহির্জগতের কঠিন প্রস্তরভূমিতে আহত হয়ে যে-সব দুর্দমনীয় অভিপ্রায় চেতনার রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে অন্তরের নিভৃততম মণিকোঠায় আত্মগোপন করে থাকে, তাদের প্রতি ফ্রয়েড্-এর অসীম শ্রদ্ধা এ-যুগের এবং পরবর্তী যুগের মানুষের কাছেও স্মরণীয় থাকবে। ফ্রয়েড্ সেইজন্য অবশ্যই আমাদের নমস্য।

প্রাক্-সামরিক যুগে মনোবিজ্ঞান মানুষের মনে যে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, সমরোত্তরকালে অর্থনীতি তার স্থান দখল করেছে। ধন-তান্ত্রিক সঙ্কটের ফলে মানুষের মন মনোবিজ্ঞানের মোহময় রাজ্য ছেড়ে অর্থনীতির নির্মম জগতের দিকে ফিরে চেয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিজয়পতাকা যখন উড়ছে, ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস যখন ভাঙেনি, জীবনের উপর অধিকার যখন ক্ষুণ্ণ হয়নি, তখন মনোবিজ্ঞানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাদের কাছে। মনোবৈজ্ঞানিক-পরীক্ষা তখন মহাসমারোহে আরম্ভ হয়ে ফ্রয়েড্-এর জয়বার্তাই ঘোষণা করেছিল। তারপর ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক সঙ্কটের গুঁতো আর ঝাঁকুনি খেয়ে মনোবিজ্ঞান তার স্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আজ ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান সেইজন্যই টলটলায়মান।

তাই মানুষ যখন আজ যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত দেহে মৃত্যুকে বরণ করছে, যন্ত্রের উন্নতি ও উৎপন্ন পণ্যের প্রাচুর্যের দিনে আজ আর্থিক সঙ্কট যখন বুভুক্ষু মানুষের বুক থেকে শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত শুষে নিচ্ছে, তখন মনোবিজ্ঞান গর্ব করে মানুষকে মুক্তির পথের সন্ধান দিচ্ছে এই বলে যে

Even in the most material field, that of economics, psycho-analysis has shown that it is rare for anyone to think freely

and behave 'normally' where money is concerned. One of the most surprising discoveries of psychoanalysis was that the idea of money is frequently a direct symbol of that of bodily dirt in the unconscious, and that the various complicated reactions to do with the latter idea constantly influence conscious judgments about money matters...Free association of ideas takes us to the subject of war itself, certainly one of the gravest sociological problems. Here psychoanalytic investigations have shown the complexity of the factors concerned and the impossibility of radically coping with them unless their unconscious roots are thoroughly examined and understood. Compared with comprehensive study of this kind, the present vague propaganda exhortations to denounce war are but pitiful fumblings, about the efficacy of which few serious thinkers are deceived.

—Ernest Jones : Psychoanalysis

"মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেখানে অর্থের সম্বন্ধ আছে সেখানে মানুষের কাছ থেকে স্বাধীন চিন্তা বা স্বাভাবিক ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় না। অর্থ প্রায়ই অবচেতন মনে শরীরী অপরিচ্ছন্নতার প্রত্যক্ষ প্রতীকস্বরূপ এবং এই ধারণার আভ্যন্তরীণ জটিলতা অর্থ সম্বন্ধে সচেতন বিচার-বিশ্লেষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মুক্ত ভাবানুষঙ্গের ফলে আমরা প্রায়ই যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হই, এবং এ-ব্যাপার যে একটি গভীর সমাজনৈতিক সমস্যা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে এই সমস্যার মূল অবচেতন কারণগুলিকে যতক্ষণ না বিশ্লেষণ করা হবে ততক্ষণ এর সমাধান অসম্ভব। মনোবিজ্ঞানের এই গবেষণামূলক অধ্যয়নের কাছে যাঁরা যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁদের সাফল্য হাস্যকর বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।"

বহির্মুখী বিপ্লবী গতিশীল মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে অন্তর্মুখী স্থাণু ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের এই হল পার্থক্য। ফ্রয়েডীয় থেরাপী কোনো নিউরটিক্ ব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করে পরীক্ষায় সফল হতে পারে, কিন্তু সাম্প্রতিক সভ্যতার নিউরটিক্ ও সাইকোটিক্ দিকগুলিকে বিচার করে তাকে ব্যাধিমুক্ত করতে

হলে ফ্রয়েডীয় ব্যক্তিক বিশ্লেষণে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব নয়। কার্ল মার্কস্ বলেন যে উৎপাদন-ক্রিয়ার এমন বৈশিষ্ট্য যে উৎপাদন-প্রণালীর মধ্যে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী মানুষের অভ্যাস, রুচি, চিন্তা ও কার্যধারা, এককথায় মানুষের স্বভাব গড়ে ওঠে। সুতরাং মানুষের স্বভাব দ্বারা ঐতিহাসিক সত্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না, ঐতিহাসিক গতির মধ্যে মানুষের স্বভাব বিভিন্নভাবে গঠিত হয়। কোনো বৈজ্ঞানিকই এই গতিশীল ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করেননি, এবং ফ্রয়েডও উৎপাদন-প্রণালীকে উপেক্ষা করে জনন-প্রণালীর (Reproductive Process) উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির দুটি প্রধান গলদ হচ্ছে—(১) সমাজের উৎপাদন-প্রণালীকে অগ্রাহ্য করেও সভ্য মানুষের জনন-প্রণালী সুন্দরভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব, এবং (২) যৌন-প্রণালীর উপসর্গগুলি বিশ্লেষণ করলে মানুষের স্বভাবের অন্তর্নিহিত অভাবগুলির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার দ্বারাই আধুনিক সভ্যতার দুরবস্থার কারণ উল্লেখ করা সম্ভব হতে পারে। নিচে থেকে উপরে না দেখে এইভাবে উপর থেকে দৃষ্টি দিয়ে মানুষ ও সভ্যতাকে বিচার করবার ফলে ফ্রয়েড্ অনেকদিন পরেও প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্রের জয়গানই গেয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে ফ্রয়েড্ লিখছেন—

I cannot enquire into whether the abolition of private property is advantageous and expedient. But I am able to recognize that psychologically it is founded on an untenable illusion. By abolishing private property one deprives the human love of aggression of one of its instruments, a strong one undoubtedly, but assuredly not the strongest. It in no way alters the individual differences in power and influence which are turned by aggressiveness to its own use, nor does it change the nature of instinct in any way."

—Sigmund Freud : Civilisation and its Discontents

"ব্যক্তিগত মালিকানাপ্রথা উচ্ছেদের ফলে কোনো সুবিধা বা উপকার হবে কিনা আমি বলতে পারি না। তবে এই প্রথা তুলে দিলে মানুষের হিংসা-কাতরতার একটি অস্ত্র থেকে যে মানুষকে বঞ্চিত করা হবে তাতে ভুল নেই, কিন্তু সে অস্ত্র সর্বপ্রধান অস্ত্র নয়। প্রভাবে ও শক্তিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য তাতে বদলাবে না, এবং মানুষের সাহজিক বৃত্তিরও কোনো পরিবর্তন হবে না।"

এইভাবে ফ্রয়েড্ মানুষিক বৃত্তির প্রতিচ্ছবি হিসাবে জগৎ ও সভ্যতাকে বিচার করেছেন, যেমন করেছিলেন হেগেল জগৎকে মনের প্রতিবিম্ব হিসাবে। কোনো উন্মাদ ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ স্নায়বিক ছন্দপতন ও বিপর্যয়ের কারণকে ফ্রয়েড্ পরিবর্ধিত করে সভ্যতা ও সংস্কৃতি-সঙ্কটের রূপ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। অথচ এই মনোবিজ্ঞানকে কিভাবে সাম্যবাদী সমাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে দেখলে বোঝা যাবে ফ্রয়েড্ তাঁর সমস্ত বৈপ্লবিক আবিষ্কার সত্ত্বেও ভুল দৃষ্টিকোণের জন্য তাঁর বিজ্ঞানকে যথেষ্ট মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারেননি। রোজেনস্টাইন্ সাম্যবাদী মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন

> We seek to make an environment that will allow of mental health, to end conditions that create conflicts. The old psychiatry shut itself up in the hospital or clinic. Doctors had no opportunity to study patients at work. To-day our psychiatrists go out to shop, school, factory, field and farm, and not only study the workers and the conditions of their work but try to see that these are such as will not create nervous troubles.
>
> —Quoted in Samuel. D. Schmalhausen's
> "The New Road to Progress"

"আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের উপযোগী প্রতিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করি, এবং যাবতীয় বিরোধ দূর করা আমাদের লক্ষ্য। প্রাচীন মনোবৈজ্ঞানিক হাসপাতালে বা ক্লিনিকে নিজেকে বন্দী করে রাখতেন। রুগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় পরীক্ষা করবার সুযোগ তাঁদের ঘটত না। আমাদের মনোবৈজ্ঞানিকেরা আজ দোকানে, স্কুলে, কারখানায়, সর্বত্রই শ্রমিকদের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে বিচার করবার জন্য যান, এবং চেষ্টা করেন যাতে তাদের কোনোরকম মানসিক গণ্ডগোল না ঘটে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে।" এইখানে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মার্কসীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভেদ। ফ্রয়েড্ প্রত্যক্ষ প্রতিবেশ থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে মানুষের অন্ধকার অন্তর্দেশে প্রবেশ করেন, এবং নানারকম স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়ের অলিগলির ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে শেষকালে মানুষের আদিম সহজবৃত্তি বা যৌনাকাঙ্ক্ষার পরিত্যক্ত নির্জন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং আদিম অন্ধকারকে সত্য প্রতিপন্ন করে মৃত্যুর জয়ডঙ্কা বাজান।

মার্কসীয় মনোবিজ্ঞান বহির্জগৎ থেকে অভিযান শুরু করে, মানুষের স্পষ্ট পরিবেষ্টনের মধ্যে মানুষের মনের প্রতিক্রিয়ার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে, সভ্যতার প্রশস্ত পথের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আলোকের সন্ধান পায়, সভ্যতার অগ্রগতি সেইজন্য সত্য হয়ে ওঠে, মানুষ জীবন্ত হয়, এবং যা কিছু সাংস্কৃতিক বিকার তার পূর্ণ আরোগ্যলাভেও আস্থা রাখে। ফ্রয়েড্ সেইজন্য বলেন

...An instinct would be a tendency in living organic matter impelling it towards reinstatement of an earlier condition, one which it had abandoned under the influence of external disturbing forces—a kind of organic elasticity, or to put it another way, the manifestation of inertia in organic life··· Through a long period of time the living substance may have ···had death within easy reach... until decisive external influences altered in such a way as to compel the still living substance to ever greater deviations from the original path of life, and to ever more complicated and circuitous routes to the attainment of the goal of death. These circuitous ways to death, faithfully retained by the conservative instincts, would be neither more nor less than the phenomena of life as we know it. If the exclusively conservative nature of the instincts is accepted as true, it is impossible to arrive at any other suppositions with regard to the origin and goal of life.

—Sigmund Freud : Beyond the Pleasure Principle

জীবন্ত জৈব পদার্থের যে-গুণ আদিম অবস্থার দিকে তাকে আকর্ষণ করে, ফ্রয়েড্ তাকে সহজ-বৃত্তি বলেছেন। বাইরের প্রভাবে এই জীবন্ত পদার্থ জীবনের প্রধান পথ থেকে দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে বহু সর্পিল পথের উপর দিয়ে মৃত্যুতীর্থের দিকে অগ্রসর হয়। সহজবৃত্তির এই স্বাভাবিক ধর্মে বিশ্বাস করলে জীবনের উৎপত্তি ও পরিণতি একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা যায় না। মৃত্যুচিন্তায় অবশ হয়ে ফ্রয়েড্ বাইরের প্রভাবকে শেষ পর্যন্ত একেবারে অস্বীকার করে ঘোষণা করলেন: "The goal of all life is death." অসাধারণ প্রতিভাশালী ফ্রয়েড সেইজন্য নিজের অক্ষমতা ও ব্যর্থতাকে স্বীকার করে গিয়েছেন, এবং

সাম্প্রতিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অবনমিত পরিবেষ্টনে পুষ্ট বিপন্ন ও বিপর্যস্ত মানুষকে তিনি কোনো আশা দিতে পারেননি

My courage fails me, therefore, at the thought of rising up as a prophet before my fellowmen, and I bow to their reproach that I have no consolation to offer …"

—Sigmund Freud : Civilisation and its Discontents

দীর্ঘদিন মানুষের মনোরাজ্যের পথে-পথে ভ্রমণ করে ফ্রয়েড্ বললেন যে মানুষ সহজবৃত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ, মানুষ নির্মম সাদী (Sadist), মানুষের অন্তরের জিঘাংসা ও যৌনবৃত্তির বহ্নি অনির্বাণ, মানুষ উন্মাদ এবং আদিমতার কারাগারে চিরযুগ বন্দী, মানুষের জীবন মৃত্যুর গোলাম। সুতরাং মানুষের কোনো মুক্তি নেই, যে-পরিবেশ মানুষকে আজ শুষে নিচ্ছে, মানুষের মজ্জা পর্যন্ত নিঙড়ে নিচ্ছে, তাকে সুন্দরতর পরিবেশে রূপান্তরিত করা মানুষের সাধ্য নয়, কারণ পিছনে রয়েছে আদিমের প্রচণ্ড আহ্বান, চিরজাগ্রত বর্বর মানুষের হুমকি, সেই যৌনক্ষুধার তাড়না, সেই অত্যাচারী, হিংসাত্মক মনোবৃত্তির হাতছানি। মানুষের মুক্তি নেই, জীবনের পরিত্রাণ নেই। মৃত্যুই জীবনের শ্রেষ্ঠ ও শেষ লক্ষ্য। যুগ যুগ ধরে সেই অচঞ্চল লক্ষ্যের দিকে মানুষ ছুটে চলেছে, বাইরের প্রভাব শুধু ঘূর্ণায়মান পথের দূরত্ব বাড়াতে পারে, কিন্তু মানুষের গতি সেইদিকেই রয়েছে, সেই নিবিড় অন্ধকার, আদিম অন্ধকার, মৃত্যুর দিকে।

এর পরে স্পেংলার-এর নৈরাশ্যবাদ ও প্রগতিবাদ-বিমুখতার কারণ বুঝতে আর কষ্ট হয় না। মুমূর্ষু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শেষ সঙ্গীত স্পেংলার-এর মারফত আমাদের কানে ভেসে আসে

Already the danger is so great, for every individual, every class, every people, that to cherish any illusion whatever is deplorable ..Only dreamers believe that there is a way out. *Optimism is cowardice.* We are born into this time and must bravely follow the path to the destined end. There is no other way…The honourable end is the only thing that cannot be taken from a man.

বিপদ ক্রমেই এমন ঘনীভূত হয়ে উঠছে, যে প্রত্যেক মানুষকে ও শ্রেণীকে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতে হবে। ওসব মিথ্যা, ভ্রম। একমাত্র স্বপ্নবিলাসীই বিশ্বাস করতে পারে যে এ-অবস্থায় মুক্তি সম্ভব। আশাবাদ

এখন কাপুরুষতারই নামান্তর। যখন এই সময়েই আমরা জন্মেছি, তখন সাহস করে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাব, তা ভিন্ন আর অন্য কোনো উপায় নেই। স্পেংলার মনে ভাবেন যে সভ্যতা একটা বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ, কোনো কিছুরই অগ্রগতি হয় না।

এজ্‌রা পাউণ্ড ও টি. এস্‌ এলিয়ট্‌ও প্রগতিবিমুখ। পাউণ্ড-এর দার্শনিক দৃষ্টি স্পেংলার-এর অনুবর্তী, তিনিও বিশ্বাস করেন সভ্যতা বৃত্তবদ্ধ—ব্যক্তি তারই বুকে সমধর্মী বুদ্‌বুদ্‌। পাউণ্ড তাঁর Cantos-এর মধ্যে সেইজন্য কোনো ঐতিহাসিক পারম্পর্য গ্রাহ্য করেননি, কোনো নায়ক নেই, এমনকি দেশকালের কোনো বিচার পর্যন্ত নেই। মহাযুদ্ধ ও এলিয়ট্‌, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও অডেন, পিপল্‌স্‌ ফ্রণ্ট্‌ ও স্পেণ্ডার ও ডে ল্যুইস্‌, মোটামুটি সমরোত্তর ইংরেজি কাব্য এইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। এলিয়ট্‌-এর 'Gerontion' বৃদ্ধ, তার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, যাবতীয় কাজ তার শেষ হয়ে গিয়েছে, রয়েছে শুধু "Thoughts of a dry brain in a dry season."

My house is a decayed house,
And the jew squats on the window sill, the owner,
Spawned in some estaminet of Antwerp,
Blistered in Brussels, patched and peeled in London.
The goat coughts at night in the field overhead ;
Rocks, moss, stone crop, iron, merds.
The woman keeps the kitchen, makes tea,
Sneezes at evening, poking the peevish gutter,
I an old man.
A dull head among windy spaces,
—*Gerontion*.

বৃদ্ধ শুধু গৌরবময় অতীতের স্বপ্ন দেখে

…in the juvenesence of the year
Came Christ the tiger.

এ হচ্ছে ১৯২০ সালের কথা। দু' বৎসরের মধ্যে বৃদ্ধ Gerontion হয়েছে Tiresias, এবং The Waste Land-এর মধ্যে কতকগুলি টুকরো প্রতিরূপ একত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। সব মিলে সুন্দর কাব্য সৃষ্টি হয়েছে।

What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish ? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images,······

—*The Burial of the Dead*

ওয়েস্ট ল্যাণ্ড্ ক্যাথলিক্ গির্জার স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাউ' হচ্ছে তার ভিত্তি। সাম্প্রতিক সভ্যতার বিপর্যস্ত পরিবেশের অন্তরালে মানুষের আদিম ধর্মবিশ্বাস শিকড় গেড়ে রয়েছে। এখানে ফ্রয়েড্-এর সঙ্গে এলিয়ট্-এর মতৈক্য আছে। রিচার্ডস্ বলেছেন যে ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড-এ এলিয়ট্-এর 'severance between his poetry and all beliefs'-এর পরিচয় পাওয়া যায়—"In the destructive element immerse. That is the way"—কিন্তু "The Fire Sermon"-এর মধ্যে

O Lord Thou pluckest me out
O Lord Thou pluckest
burning

—এলিয়ট্-এর বিশ্বাসের সাক্ষ্য মেলে। ধ্বংসের মধ্যে যে নৈরাশ্য 'What the Thunder Said'-এ তাই অভিব্যক্ত হয়েছে

What is that sound high in the air
Murmur of maternal lamentation
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Veinna London
Unreal

প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে এলিয়ট্ শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগের সুন্দর সংহত শান্তির মধ্যে ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। মধ্যযুগের শিল্প ও জীবন প্রাথমিক অবস্থায় থাকার ফলে ধর্ম ছিল তাদের উপর পক্ষ বিস্তার করে। গির্জার অতি-প্রাধান্যের জন্য তাদের প্রসার সম্ভব হয়নি। ধর্মকে কেন্দ্র করে

মধ্যযুগ সংস্কৃতির বিচিত্র ধারাকে একটি সমন্বয়ের প্রবাহে মিলিত করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং এলিয়ট্ বর্তমান সভ্যতার বিরোধ, হীনতা ও দীনতার মধ্যে জীবনের পূর্ণতার কোনো হদিশ না পেয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য সেই সমন্বয় ফিরে চান। গির্জার অভিভাবকত্বে মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় এলিয়ট্-এর কাম্য। 'Choruses from 'the Rock'-এর মধ্যে সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে

Men have left GOD not for other gods, they say, but for
no god, and this has never happened before
That men both deny gods and worship gods, professing
first Reason,
And then Money, and Power, and what they call Life, or
Race, or Dialectic.
The Church disowned, the tower overthrown, the bells up-
turned, what have we to do
But stand with empty hands and palms turned upwards
In an age which advances progressively backwards ?

ড্রয়িংরুমে প্রুফ্রক্-এর সাহচর্য ছেড়ে ওয়েস্টল্যাণ্ড পার হয়ে এলিয়ট্ শেষকালে পৌছলেন সৃষ্টি ও সমালোচনার তীর্থসঙ্গমে। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার তাঁর কাছে কোনো মূল্য নেই। জীবন ও সভ্যতার একমাত্র মানদণ্ড হল শাশ্বত ধর্ম, ক্যাথলিক গির্জা।

সভ্যতার পূতিগন্ধ শহরের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে পল্লী অঞ্চলের প্রতিবেশ পর্যন্ত কলুষিত করেছে। সেখানেও আর সেই প্রশান্ত জীবন নেই, জীবনের ছন্দপতন ঘটেছে।

Here too corruption spreads its peculiar and emphatic
odours.
And life lurks, evil, out of epoch.

অডেন ও ঈশারউড্ 'The Dog Beneath the Skin, or where is Francis ?' নামক গীতিনাট্যের মধ্যে ইউরোপের সামাজিক ও নৈতিক জীবনের শোচনীয় অবনতিকে বিদ্রূপ করেছেন। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ শুধু বিরাট ধাপ্পা ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং ধাপ্পাবাজ শাসনকর্তারা ভদ্রতার মুখোস পরে অন্তরালে লম্পট ও বর্বরের মতো এক শ্রেণীকে শোষণ

করে ফাঁপছেন। সেইজন্য জীবনে কোথাও শান্তি নেই, চারিদিকে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা। অডেন ও ইশারউড্‌ও ওয়েস্টল্যাণ্ড্‌ অতিক্রম করে যেতে পারেননি, তবে নূতন কোনো গ্রেল্‌-এর সুদূর ইঙ্গিত তাঁরা দিয়েছেন।

মরণোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজ কতদূর পর্যন্ত যে তার কদর্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে, ইংল্যণ্ডের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী এইচ্‌. জি. ওয়েলস্‌ (H. G. Wells) তার প্রমাণ। ওয়েলস্‌ তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে 'হা অদৃষ্ট!' বলে আক্ষেপ করে বলেছেন যে আজীবন তিনি তাঁর মস্তিষ্ককে যথাসাধ্য ঝাঁকুনি দিয়ে বিপন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা করেছেন, কিসে মানুষের মঙ্গল হবে, জাতির কল্যাণ হবে, পৃথিবীতে আবার শান্তিরাজ্য স্থাপিত হবে তার জন্য বেতার, গ্রামোফোন, যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, উপন্যাস, গল্প, রূপকথা প্রভৃতি এমন কিছু নেই যা তিনি চর্চা করেননি, কিন্তু পদে-পদে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, পরাজিত হয়েছেন, ঠকেছেন, তাঁর উপদেশ তাঁর প্রভুরা হেলায় অগ্রাহ্য করেছে, তিনি উন্মত্ত বৃষের মতো দ্বারে-দ্বারে প্রাণপণ চিৎকার করে ঘুরেছেন তবু কেউ তাঁর মূল্যবান উপদেশ, তত্ত্বকথা ও বাণী শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেননি, পিঠ থাব্‌ড়ে "বহুত আচ্ছা" বলে গা-ঢাকা দিয়েছেন। ওয়েলস্‌-এর বিশ্বাস যে তাঁর মতো অসাধারণ প্রতিভাশালী বুদ্ধিবাদী বা জীবীরা মানুষের জীবনকে ভেঙেচুরে নূতন ভিত্তির উপর গড়বার চেষ্টা করছেন, এবং যদি কেউ, সমাজের কোনো শ্রেণী, মানবসভ্যতাকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন তাহলে একমাত্র বুদ্ধিজীবীরাই হবেন। ওয়েলস্‌ বলেন: "We originative intellectual workers are reconditioning human life," কিন্তু দুঃখের বিষয় শাসকশ্রেণীর জঘন্য একগুঁয়েমির জন্য "We had··· in plain English to be outwitted, cheated, discredited, and frustrated···" তিতবিরক্ত হয়ে ওয়েলস্‌ সেইজন্য বলেছেন যে: "It made me waver towards the dogma of the class war." শাসকশ্রেণীর উপর অভিমান করে মহাপণ্ডিত ওয়েলস্‌ শেষ পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রামের সংস্কারের দিকে আকৃষ্ট হননি। মনিবেরা জানেন ওয়েলস্‌-এর মতো বুদ্ধিমান নোকরদের কিভাবে খুশি রাখতে হয়। ওয়েলস্‌-এর অভিমান দূর করতে তাঁদের বেগ পেতে হয়নি। ওয়েলস্‌ তারপরেই মস্তিষ্ক হেলিয়ে শান্তির দিনে শ্রমিকদের আনুগত্য দেখে বিদ্রূপ করে বলেছেন

'And this', thought I, 'is the reality of democracy ; this is the proletariat of dear old Marx in being. This is the real people. This seething multitude of vague kindly uncritical brains is the stuff that old dogmatist counted upon for his dictatorship of the proletariat, to direct the novel and complex organisation of a better world !' The thought suddenly made me laugh aloud.

—H. G. Wells : Experiment in Autobiography

ওয়েলস্-এর এই মতের সঙ্গে "intellectual hooligan" স্পেংলার-এর বক্তব্য তুলনা করা চলে

No good retainer dreams of regarding peasants as his equals, and every foreman who knows his job refuses to allow unskilled labourers to address him on terms of equality. This is the *natural* feeling in human relations. *Equal rights* are contrary to nature ...

—Oswald Spengler : The Hour of Decision

ওয়েলস্-এর ধূমায়মান মগজ-প্রসূত সর্বশেষ থিসিস্ (The New World Order) হচ্ছে : "Waste no more time on the spectacle of the Marxist putting the cart in front of the horse and tying himself up with the harness," এবং মার্কসীয় দর্শন অনুসারে "to suggest that all people of wealth and capacity living in a community in which unco-ordinated private enterprise plays a large part are necessarily demoralised by the advantages they enjoy and that they must be dispossessed by the worker and the peasant…"—ওয়েলস্-এর মতে নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত। অর্থাৎ ওয়েলস্ বলেন যে বুর্জোয়াশ্রেণী বা ধনিকগোষ্ঠী যে অনিষ্টকর হবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। নির্বোধ কৃষক ও শ্রমিকদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই সমস্ত জটিল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে এ-কথা প্রতিপন্ন করা মূর্খতা। ধনিকগোষ্ঠী সভ্যতার কল্যাণকামী এখনো রয়েছেন, প্রয়োজন শুধু ওয়েলস্-এর মতো অসাধারণ মগজের। ওয়েলস্-এর বদ্ধমূল ধারণা তাঁর মতো কয়েকজন ব্যক্তি পর্বত-পাণ্ডিত্য নিয়ে মানুষের সবকিছু বিপদ আপদ জয় করতে পারবেন, নীরেট মূর্খ শ্রমজীবীদের কোনো শক্তি নেই। শ্রমিকদের উপর মস্তিষ্কের প্রভুত্ব

করা তাঁদেরই ন্যায্য অধিকার, সে-অধিকার থেকে তাঁদের যে-সব উন্মাদ মার্কস্-পন্থীরা বঞ্চিত করতে চান তাঁরা পৃথিবীর অমঙ্গলকে আহ্বান করে আনেন। ওয়েলস্-এর এই কাল্পনিক বুদ্ধিবাদীর রাজ্য গঠনের প্রস্তাবে স্ট্যালিন্ উত্তর দিয়েছিলেন :

> The technical intelligentsia can, under certain conditions, perform miracles and greatly benefit mankind. But it can also cause great harm. We Soviet people have got a little experience of the technical intelligentsia. After the October Revolution a certain section of the technical intelligentsia refused to take part in the work of constructing the new society; they opposed this work of construction and sabotaged it···Of course things would be different if it were possible at one stroke spiritually to tear the technical intelligentsia away from the capitalist world. But that is Utopia. Are there many of the technical intelligentsia who would dare break away from the bourgeois world and set to work to reconstruct society? Do you think there are many people of this kind, say, in England or in France? No; there are few who would be willing to break away from their employers and begin reconstructing the world.
>
> —Stalin-Wells Talk

বুদ্ধিজীবীরা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ও অবস্থায় বিস্ময়কর কিছু করতেও পারেন এবং তাতে মানুষের উপকারও হতে পারে। কিন্তু তাঁরা অনেক সময় ক্ষতিও করে থাকেন। আমরা, সোভিয়েট জনসাধারণ, আমাদের এই বুদ্ধিজীবী সম্বন্ধে বিশেষ কম অভিজ্ঞতা নেই। অক্টোবর বিপ্লবের পর বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর একদল আমাদের নূতন সমাজ-গঠনকার্যে সহায়তা করতে আপত্তি করেছিলেন, এমনকি আমাদের কাজের ক্ষতি করতেও কুণ্ঠিত হননি। ···অবশ্য যদি কোনো ভৌতিক উপায়ে তাঁদের ধনিকগোষ্ঠীর কবল থেকে উদ্ধার করে আনা যায়, তাহলে হয়তো অন্য কিছু তাজ্জব ব্যাপার ঘটতে পারে। কিন্তু তা হয় না, ও আশা কল্পনাবিলাস ভিন্ন কিছু না। ক'জন বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা তাঁদের ধনিকপ্রভুদের আওতা ছেড়ে নূতন সমাজ-গঠনে সাহায্য করবেন? আপনি কি ভাবেন যে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে সে-রকম

বুদ্ধিজীবী অনেকেই আছেন? নেই, থাকতে পারে না, কারণ প্রভুর ছায়াতল ছেড়ে নূতন সমাজ-গঠনের কাজে কোনো বুদ্ধিজীবীই নিযুক্ত হতে সম্মত হবেন না।"

ওয়েলস্-এর মতো বহু পণ্ডিত, এমনকি মনীষী রাসেল পর্যন্ত কাল্পনিক রাজ্যে বাস করেন। কিন্তু রাসেল যে-সংযম ও প্রজ্ঞা-নিষ্ঠার জন্য আমাদের শ্রদ্ধা দাবী করতে পারেন, ওয়েলস্ তার পরিবর্তে পেতে পারেন তাচ্ছিল্য-মিশ্রিত করুণা, এবং শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের অশ্রদ্ধা। রাসেল সাম্যবাদের অধিবক্তা না হলেও তার গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলি স্বীকার করবার মতো সৎসাহস তাঁর আছে। রাসেল আধুনিক শিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে বলেছেন

Communism offers a solution of the difficult problem of the family and sex equality···It gives children an education from which the anti-social idea of competition has been almost entirely eliminated. It creates an economic system which appears to be the only practicable alternative to one of masters and slaves. It destroys that separation of the school from life which the school owes to its monkish origin, and owing to which the intellectual, in the West, is becoming an increasingly useless member of society. It offers to young men and women a hope which is not chimerical and an activity in the usefulness of which they feel no doubt. And if it conquers the world, as it may do, it will solve most of the major evils of our time. On these grounds, in spite of reservations, it deserves support.

—Bertrand Russell : Education and the Modern World

এখানে রাসেল সাম্যবাদের সব গুণগুলিকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। পরিবার ও যৌন-সমস্যার সমাধান একমাত্র সাম্যবাদী সমাজেই সম্ভব। সাম্যবাদী শিক্ষার ফলে শিশুদের মন থেকে সমাজ-বিরোধী প্রতিযোগিতার ভাব দূর হয়ে যায় এবং এমন অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে প্রভু ও ক্রীতদাসের ব্যবধান থাকে না। সাম্যবাদী সমাজে জীবন থেকে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন করা হয় না, পশ্চিমে যে-বিচ্ছেদের ফলে বুদ্ধিজীবীরা সমাজের কাছে অকর্মণ্য হয়ে রয়েছে। সাম্যবাদ আধুনিক তরুণ-তরুণীদের মনে যে-আশার সঞ্চার করে সে-আশার আলো আলেয়ার মতো মিথ্যা নয়।

সাম্যবাদ যদি পৃথিবীতে জয়ী হয়, এবং জয়ের সম্ভাবনা তার আছে, তাহলে এ-যুগের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। এই কারণে, কিছু ত্রুটি থাকলেও, রাসেল বলেন সাম্যবাদ সমর্থনযোগ্য।

মনীষী রাসেলের এই সৎসাহসের চিহ্ন ওয়েলস্-এর কেতাবের স্তূপ হাতড়ালে কোথাও পাওয়া যাবে না। ওয়েলস্-এর আকাশস্পর্শী পাণ্ডিত্যাভিমান থেকে তাঁর নিজস্ব শ্রেণীধর্মের প্রতি আনুগত্যই প্রমাণিত হয়। পণ্ডিতগর্দভ ওয়েলস্ নিজের পেটী-বুর্জোয়া আদর্শের পিছনে চিরদিন ছুটেছেন, এবং মরীচিকা অনুসরণ করে নিজের বিদ্যার অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে তিনি মার্কস্কে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। ওয়েলস্-এর প্রত্যেক তথাকথিত গবেষণামূলক রচনার মধ্যে মার্কস্কে নির্মমভাবে শ্লেষ করবার যে অমার্জনীয় ধৃষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে, তা তাঁর মতো প্রায় সব ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অধুনা শিল্পীরা যে নৈরাশ্যবাদ ও মৃত্যুযন্ত্রণার নরকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, সেখান থেকে তাঁদের মুক্তি নেই যতদিন না তাঁরা সমাজের প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক বাস্তবকে অন্তরের সহিত উপলব্ধি করতে পারবেন। সে-উপলব্ধি একমাত্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিরলম্ব মঞ্চ ত্যাগ করাতেই সম্ভব। স্পেংলার ও ওয়েলস্ আজ সেই নিরলম্ব মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কালাপাহাড়ী তাল ঠুকে রাসভের মতো চিৎকার করে ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির দীর্ঘায়ু কামনা করছেন। আজ সংস্কৃতির বিচিত্র ধারাকে ভবিষ্যতের সমন্বয়ের প্রবাহে মিলিত করবার দায়িত্ব একমাত্র সাম্যবাদীদের।

সঙ্কট কোথায়? আবর্জনাকীর্ণ এ-পৃথিবীর মরুপ্রান্তরের কোণ থেকে বৃদ্ধ জিরনশান্-এর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—'আমার গৃহ ধ্বংসোন্মুখ'—"My house is a decayed house"—আকাশে-বাতাসে প্রাসাদ ভাঙার শব্দ, জেরুজালেম্, এথেনস্, আলেকজাণ্ড্রিয়া, ভিয়েনা, লণ্ডন, ধসে পড়ছে, সব অবাস্তব, অত্যাচারী, স্বার্থপর, অর্থপিশাচ মানুষের চলাচল চারিদিকে, পঙ্গু জীবনের গতির ছন্দ শিথিল হয়ে এসেছে, মানুষের দুর্গন্ধে বাতাস কলুষিত—মুক্তি কোথায়? মুক্তির কথা, স্পেংলার বলেন, উন্মাদের প্রলাপ ভিন্ন কিছু না, —"*Everything-become* is mortal, not only peoples, languages, races but Cultures are transient"—সুতরাং ধ্বংস অনিবার্য, আজ সেই অদৃষ্টকে হাসিমুখে মানুষের বরণ করা উচিত। বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমজীবীশ্রেণীর যে-সংগ্রাম সেই সংগ্রামের জয়ে যে নূতন সমন্বিত সভ্যতার সৃষ্টি হবে

তার মধ্যে মানুষ আবার নূতন মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে। ওয়েলস্ বলেন মার্কস্‌-এর এই গোঁয়ারতমি অর্থহীন, মূর্খ শ্রমজীবীদের দ্বারা মুক্তি সম্ভব নয়, তাঁর মতো ভোজবাজি থেকে যৌনতত্ত্ব ও রাজনীতি পর্যন্ত সর্ববিদ্যাবিশারদদের দ্বারা সভ্যতার ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভব।

সঙ্কট এইখানে। ওয়েলস্ ও স্পেংলার-এর এই শূন্যগর্ভ দর্শনের মূল কোথায় সন্ধান করলেই সঙ্কটের কারণ বোঝা যাবে, এবং এ-সঙ্কট যে সংগ্রামের দ্বারা জেয় তাও বিশ্বাস্য হবে। পরের অধ্যায়ে এই সঙ্কটের মূলকারণ হচ্ছে আলোচ্য বিষয়।

একাদশ অধ্যায়

মধ্যবিত্তশ্রেণী ও সমাজ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) পূর্বে অভিজাত-গোষ্ঠী ও সমাজের নিম্নতমশ্রেণীর মধ্যে আরও একটি শ্রেণী ছিল। ছোট-ছোট ভূমির মালিক, ব্যবসাদার, কৃষক ও কারিগর,—এরা ছিল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় ভূস্বামীদের কাছ থেকে বংশপরম্পরায় এরা ভূমি ভোগ করত। কৃষকেরা প্রচলিত প্রথানুসারে বা খাজনা দিয়ে খণ্ড-খণ্ড ভূমি দখল করত। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু তা তারা নিজেরাই উৎপাদন করত। 'স্বাধীনতার' অহঙ্কার ছিল এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর সকলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারাই ছিল তাদের নিজেদের প্রভু, এবং এই আত্মপ্রভুত্বের ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। জীবনে চারিদিক থেকে তারা বেশ নিরাপত্তা অনুভব করত। ইংল্যাণ্ডের বর্তমান যুগের মধ্যবিত্তেরা, আত্মপ্রভুত্ব, স্বাধীনতাপ্রীতি, অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় মনোবৃত্তি উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাচীন মধ্যবিত্তদের কাছ থেকেই পেয়েছে। যদিও প্রাচীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে এদের পার্থক্য অনেক তবু সেই প্রাচীন মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকেই যে এদের বিকাশ তা অস্বীকার্য নয়। পুরাতন মধ্যবিত্তশ্রেণী এখনো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

শিল্পবিপ্লব এসে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল। সেই আঘাতে এই শ্রেণীর খানিকটা অংশ ধসে গেল, অবশিষ্ট অংশ উপরে ভেসে উঠলো। ছোট ব্যবসাদার ও কারিগরেরা হল কারখানার শ্রমিক। নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি, অর্থাৎ নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে তাদের প্রাধান্য গেল কমে। ক্রমে তারা নিজেদের উপার্জিত মজুরির উপর নির্ভরশীল হল। মুষ্টিমেয় একদল ভিন্ন প্রায় সকলেই অর্ধ-স্বাধীন মধ্যস্তর থেকে বিচ্যুত হয়ে নিম্নস্তরের শ্রমজীবী হল। যারা এই শ্রমজীবীর স্তরে স্থানান্তরিত হতে চাইল না তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। ছোট ব্যবসাদারদের ক্ষেত্র পূর্বের চাইতে প্রসারলাভ করল, কারণ নূতন শ্রমজীবীশ্রেণীর চাহিদা বাড়ল। সুতরাং প্রাচীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধ্বংসের পাশাপাশি, দোকানদার, ব্যবসাদারদের নিয়ে একটি অংশ পূর্বকার 'আত্মপ্রভুত্ব' ও 'স্বাধীনতা' বজায় রাখল। এইসময় শাসন-কার্যের জন্যও উপযুক্ত লোকের তাগিদ এল। ছোট-ছোট ভূমির মালিকদের

মধ্যে উপরের স্তরভুক্ত যারা তারা শ্রেণীচ্যুত হয়ে এই নূতন কাজের ভার গ্রহণ করল। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের প্রাথমিক অবস্থায় বৃটেন-এ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মধ্যে এইভাবে পরিবর্তন আসে।

শস্য আইন (Corn Laws) নাকচের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক বৃটেন্-এর পরবর্তী অগ্রগতি স্থচিত হয়। ভূমির অধিকারী অভিজাতগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই আইন পাস করেছিল। শস্যের চড়া মূল্য ঠিক রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। নূতন ধনিক শিল্পপ্রভুরা এই আইনের বিরোধী ছিল, শুধু পুরাতন অভিজাত শাসকশ্রেণীকে বিচ্যুত করে নিজেরা শাসনাধিকার লাভের জন্য নয়, শস্যের মূল্য সস্তা হলে শ্রমিকশ্রেণীকে কম মজুরী দেওয়া সম্ভব হবে এবং উৎপাদনের খরচ কমবে বলে। ১৮৪৬ সালে নূতন শ্রেণীর, অর্থাৎ শিল্পপ্রভুদেরই জয় হল, শস্য আইন উঠে গেল। পৃথিবীর বাজারে সস্তা বৃটিশ দ্রব্য প্রচুর সরবরাহ করা হল। ধনতন্ত্রের নূতন, গৌরবময় যুগ এল বৃটেন্-এ।

প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস মোটামুটি ঠিকই রইল। ষষ্ঠ দশকে বৃটেন্ পণ্য রপ্তানি থেকে মূলধন রপ্তানির দিকে বেশি নজর দিল, এবং বৃটিশ ধনতন্ত্রের বিকাশের নূতন পর্যায় আরম্ভ হল। ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয় নিল, এবং সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠীর মনে হল যেন শান্তি ও প্রাচুর্যের উপর তাদেরই চিরস্থায়ী অধিকার আছে, জীবনের অবিচ্ছিন্ন শান্তি থেকে তারা আর কোনোদিন বঞ্চিত হবে না। পুরাতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর যে ধ্বংসাবশেষ তখনো ছিল, তারা পূর্বাপেক্ষা নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আরো বেশি নিশ্চিন্ত হল। বৃটিশ শিল্প-ব্যবসা তখনো সঙ্ঘবদ্ধ হয়নি। শিল্পসঙ্ঘ (Combines), শিল্পের কেন্দ্রীকরণ (Centralisation) বা র্যাশানালাইজেশন্ তখনো বৃটেন্-এ খুব মন্থর গতিতে চলেছে। শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি র্যাশানালাইজেশন্ দ্বারা কমানো হয়নি, মূলধনের রপ্তানির দ্বারা তাকে সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। মূলধন রপ্তানির ফলে মূলধন নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের প্রাধান্য বাড়া খুব স্বাভাবিক। ধন-ব্যবস্থার (Financial System) এই বিকাশের ফলে, এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের সমারোহের সঙ্গে-সঙ্গে, নূতন একদল অফিসের কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রভৃতির চাহিদা বাড়ে। এই চাহিদা এত বেশি তীব্র হয় যে এমনকি শ্রমিকদের শিক্ষালয় থেকেও "best brain"-দের তলপ্ পড়ে।

বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত এইচ্ জি ওয়েলস্‌-এর (H. G. Wells) শৈশব ও যৌবন বৃটেন্‌-এর এই "best brain"-এর কলরব-মুখরিত প্রতিবেশের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ওয়েলস্ যৌবনে তাঁর রঙিন চোখ মেলে দেশের দিকে চেয়ে দেখলেন যে তাঁর শ্রেণীভুক্ত যাঁরা, দিব্যি আরামে তাঁরা নূতন সাম্রাজ্য-প্রমত্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় দিন কাটাচ্ছেন, এবং শুধু ধারাল মগজের মালিক হলেই জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার আর কোনো কারণ থাকবে না। মস্তিষ্ক দিয়ে বুর্জোয়াপ্রভুদের নূতন সাম্রাজ্যবাদী উদ্যমে যাঁরা সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ওয়েলস্‌ও একজন ছিলেন। জীবনের সেই মোহ ও ভ্রম, ব্যক্তিগত জীবনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে বেড়েছে এবং ওয়েলস্ প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা আজও তাই "best brain", "originative intellectual", "directive *elite*" প্রভৃতির কলরব থেকে বিরত হননি। ধনতন্ত্রের সাময়িক পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীর শ্রেষ্ঠত্বের উপর তাঁদের যে ভুল বিশ্বাস জন্মেছিল, সে-বিশ্বাস আজো অন্তর্ধান তো করেইনি, উপরন্তু মনের ভিতর বদ্ধমূল হয়ে গিয়ে বাইরে বিকৃতরূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ফলে নূতন সাম্রাজ্যবাদী জীবন আরম্ভ হল। চারিদিকে নির্বিচার শোষণের ফলে বিরোধ ও সংঘর্ষ মূর্ত হয়ে উঠল। এই সংঘর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হল বোয়ার যুদ্ধ (Boer War)। সংগ্রামে বৃটেন্‌-এর জয় হল, এবং তারপর থেকে ধনস্বার্থ প্রথম স্থান অধিকার করল, পণ্যরপ্তানির প্রাধান্য গেল কমে। এইভাবে ধনিকবাদের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে পণ্যোৎপাদনের জন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কের বিকাশও লক্ষ্যণীয়। অর্থ লেনদেনের কর্তব্য সম্পাদন থেকে ব্যাঙ্ক ক্রমে গচ্ছিত ধন থেকে নিজেরা মূলধন স্থষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করল। ব্যাঙ্কের এই গচ্ছিত ধন হল নৈর্ব্যক্তিক গচ্ছিত ধন (Impersonal Investment)। বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার জন্য ব্যাঙ্কের এই মূলধন-স্থষ্টির প্রণালী আরো বেশি তীব্রতর হল। বুর্জোয়াদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব একরকম প্রায় লোপ পেল, এবং শিল্পের এজমালী প্রথার (Joint-stock System) সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাঙ্কেও এজমালী প্রথা প্রবর্তিত হল। ন্যস্তধন (Investment) কারও ব্যক্তিগত মূলধন না হয়ে, মূলধনের মূলধন হল, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নানারকম গচ্ছিত ও আমানতের (Deposits) একটি অংশ হল মূলধন। ব্যাঙ্কের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে

"Loans create deposits"-এর যে-কাহিনী আছে তার অর্থ হল এই।* মূলধন যদিও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিরই মূলধন রইল, তবু সেই মূলধনকে ন্যাস করবার (Invest) পদ্ধতি হল নৈর্ব্যক্তিক, এবং তখন মূলধন ব্যক্তির না হয়ে, বেনামী মূলধন হল। যে পাঁচটি বৃহৎ বৃটিশ ব্যাঙ্কের কথা আমরা শুনে থাকি তাদেরই মধ্যে এই মূলধন কেন্দ্রীভূত রইল। ব্যাঙ্কের দ্বারা ব্যাঙ্কের মারফত গচ্ছিতের এই বেনামী মূলধনকেই (Anonymous Capital) আমরা 'Finance Capital' বলে থাকি।

এই যে ব্যাঙ্ক ও শিল্পের উন্নতি হল, এবং নানারকম প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেল, সেগুলিকে পরিচালনা করবার ভার পড়ল কাদের উপর? এই প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারা বুদ্ধি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখল? নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপরের স্তরভুক্ত যাঁরা তাঁরাই এ-কাজের দায়িত্ব নিলেন। পণ্যোৎপাদনের অবস্থা থেকে মূলধন রপ্তানি পর্যন্ত ধনতন্ত্রের যে পরিবর্তন হল, প্রাথমিক সঞ্চয়ের গৃহান্তর্গত প্রচেষ্টা থেকে সাম্রাজ্যবাদের বহির্মুখী প্রসারে ধনতন্ত্র যে-রূপ গ্রহণ করল, তাতে বুর্জোয়াশ্রেণীর পরিবর্তন হল। ধনতন্ত্রের প্রাথমিক সঞ্চয়ের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীরও পরিবর্তন হল। ধনতন্ত্রের প্রাথমিক সঞ্চয়ের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল সক্রিয়, তখন গঠন করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। দেশের ও সমাজের রূপ আমূল পরিবর্তন করবার দায়িত্ব তখন তারা নিয়েছিল। আজ বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকাংশের আয় বিদেশী গচ্ছিতের উপর নির্ভর করে। আজ বৃটেন্-এর যে-কোনো খাঁটি ধনিক হচ্ছেন "anonymous dividend-drawer", বেনামী গচ্ছিতের মোটা লাভাংশ থেকেই তাঁর মেদবৃদ্ধি হয়। এ-কথা বিখ্যাত বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্ জে. এম্. কীনস্‌ই (J. M. Keynes) স্বীকার করেছেন। স্ট্যালিন্-ওয়েলস্ কথোপকথনের সমালোচনা প্রসঙ্গে কীনস্ বলেছেন :

> Queen Victoria died as the monarch of the most capitalistic empire upon which the sun has (or has not) set···The leaders of the City and the captains of industry were tremendous boys at the height of their glory···When the giants fell with the years, a different sort of tree was found growing underneath...The capitalist has lost the source of his inner

* Dr. Walter Leaf-এর "Banking" দ্রষ্টব্য।

strength—his self-assurance, his untameable will, his belief in his own beauty and unquestionable value to society··· Thus for one reason or another, Time and the Joint Stock Company and the Civil Service have silently brought the salaried class into power". (J. M. Keynes on Stalin-Wells Talk).

রাণী ভিক্টোরিয়া যে বৃহৎ ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন, সে-সাম্রাজ্যের সূর্য আজ অস্তাচলে···শহরের নেতৃবৃন্দ ও শিল্পের নায়কেরা তখন বালসুলভ স্ফূর্তিতে গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল···যখন তাদের পতন হল তখন নীচ থেকে আর একটি বৃক্ষ ক্রমে বাড়তে লাগল···নিজেদের আভ্যন্তরীণ শক্তি, আত্মবিশ্বাস, অদম্য সঙ্কল্প, সমাজের কাছে নিজেদের মূল্য ও সৌন্দর্য ধনিকশ্রেণী হারাল···এবং এই কারণে ক্রমে এজমালী প্রথা ও সিভিল সার্ভিসের জন্য বেতনভোগী একটি শ্রেণী ক্ষমতা লাভ করল। কীনস্-এর এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধেয়, কারণ এর মধ্যেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের আত্ম-বিশ্বাসের, আত্মশক্তির ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের মূল নিহিত আছে। কীনস্ বাহ্যিক সত্যকে স্বীকার করেও মধ্যবিত্তদের ক্ষমতালাভের ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করতে পারেননি।

তাহলে ধনতান্ত্রিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিকাশের প্রত্যেক স্তরের ঘাতপ্রতিঘাতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি অংশ উপরে ক্রমে বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে মিশে যায় এবং আর একটি অংশ ক্রমে নীচের দিকে নামতে থাকে। উপরের স্তরে যারা উন্নীত হয় তাদের সংখ্যা খুব অল্প, এবং যারা ক্রমে নেমে আসে শ্রেণীচ্যুত হয়ে তাদের সংখ্যা হাজার-গুণ বেশি। শিল্প ব্যবসা ক্রমে কেন্দ্রীভূত ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ফলে এই শ্রেণী-ভাঙন ঘটে। আমেরিকা, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে যেখানে শিল্পব্যবস্থার এই সঙ্ঘবদ্ধতা বৃটেন্-এর চাইতে তীব্রতর, সেখানে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাস্তব জীবনের অবনতির সঙ্গে-সঙ্গে নৈতিক জীবনের অবনতি আরো বেশি দ্রুত ঘটেছে। ফলে জার্মানি ও ইতালীতে ফ্যাশিজম্-এর অভ্যুত্থান হয়েছে শুধু মধ্যবিত্তশ্রেণীর দিক থেকে "ফিনান্স ক্যাপিটালে"র সমর্থন-থাকার জন্য।

টেক্‌নিসিয়ান্, বৈজ্ঞানিক, লেখক, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি যাদের বুর্জোয়া-শ্রেণী একসময় নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করেছিল

সাদরে, আজ তাদের সংখ্যা ভীষণভাবে না কমিয়ে দিলেও সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র তাদের স্বল্প বেতনে নিযুক্ত রেখেছে শুধু যান্ত্রিক উপায়ে কর্তব্য পালনের জন্য। বুর্জোয়াশ্রেণী বিকাশের জন্য, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একদিন যেসব মধ্যবিত্ত শিক্ষিতেরা নিজেদের মস্তিষ্ককে সৃষ্টিকার্যে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল, আজ তাদের সেই সৃষ্টিই বুর্জোয়াদের ভয়ের কারণ হয়েছে। বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি বুর্জোয়াশ্রেণী কামনা করে না, কারণ বিজ্ঞানের যে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ-সাধন করা, জীবনের সচ্ছলতা আনা, তার সঙ্গে আধুনিক স্বখাত সলিলে নিক্ষিপ্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্দেশ্যের বিরোধ ঘটবে। বিজ্ঞানের উপর আজ তাই নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে, বৈজ্ঞানিক আজ তাঁর বীক্ষণাগারে শৃঙ্খলিত বন্দী। বৈজ্ঞানিকের গবেষণার মূলে আজ মানুষের হিতৈষণার প্রেরণা নেই। আজ ধনিকগোষ্ঠীর জিঘাংসাবৃত্তি বৈজ্ঞানিকের মনে সংক্রামিত হয়েছে, তাই মানুষকে হত্যা করবার জন্য বিষাক্ত গ্যাসের ফরমুলাতে তিনি মনোনিবেশ করেছেন। সেই বিষাক্ত গ্যাসের দুর্গন্ধি প্রতিবেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অন্ধ হয়ে গর্বিত স্যামসন্-এর মতো কখনো বুর্জোয়া ফিলিস্টাইন্‌দের অভিশাপ দিচ্ছেন, কখনো দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে বলছেন জীবন অর্থহীন, এ-বিশ্ব রহস্যময়। আর এইচ. জি. ওয়েলস্-এর মতো বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা সারাজীবন মস্তিষ্ক খাটিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর অক্লান্ত সেবা করে এসেছেন, তাঁরা একদিকে তারস্বরে চিৎকার করছেন "out-witted", "cheated", "frustrated" হয়েছেন বলে, আর একদিকে প্রাক্তন, সাবলীল, মন্দাক্রান্তা ছন্দোবদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবনের মোহ ও কল্পনার নাগপাশ ছিন্ন করতে না পেরে বলছেন যে একমাত্র "directive *elite*", "originative intellectual"-রাই সমাজের মুক্তি ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারে। শিল্পীদের অবস্থাও হয়েছে বৈজ্ঞানিকের মতো। একসময় নূতন বুর্জোয়াশ্রেণীর জীবনের উল্লাস ও উদ্দামতা দেখে, চারিদিকে কর্মমুখর বুর্জোয়াদের সৃষ্টিকার্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, নূতন সমাজের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে, শিল্পীরা ও সাহিত্যিকেরা মানুষের, সমাজের ও জীবনের যে জয়গান গেয়েছিলেন, আজ সেই বুর্জোয়াশ্রেণীর কদর্য পরিণতি, সেই বুর্জোয়াসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকৃত মলিন রূপ, তাঁদের মনে বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে, নৈরাশ্যবাদ, অবিশ্বাস, মৃত্যুচিন্তা, মানুষের স্বাভাবিক দৌর্বল্য ও হীনতায় বিশ্বাস, এইসব অনিষ্টকর ধারণার ইন্ধন জুগিয়েছে। আজ তাঁরা বুর্জোয়াশ্রেণীর বীভৎস পরিণতির সঙ্গে নিজেদের জড়িত দেখছেন। মুষ্টিমেয়, সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিকদের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে তাঁরা বৃহত্তম

মানবগোষ্ঠীকে অভিশাপ দিচ্ছেন, মানবসভ্যতাকে ধ্বংসোন্মুখ বলে ঘোষণা করছেন। তার কারণ পূর্বেই বলেছি যে তাঁরা সকলেই প্রায় উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে বহুদিনের আত্মীয়তার স্মৃতি আজ পীড়াদায়ক হলেও তাঁরা সম্পূর্ণ তা ভুলতে পারেননি।

এই কারণে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্বন্ধে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ "Communist Manifesto"-তে বলেছেন যে মধ্যবিত্তশ্রেণী, ছোট ব্যবসাদার, দোকানদার —এরা সব বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রাম করে শুধু নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার স্বার্থ নিয়ে। এইজন্যই তারা বিপ্লবী নয়, বিপ্লব-বিরোধী ও রক্ষণ-শীল। এরা সমাজের প্রগতিকে বাধা দেয়, ইতিহাসের প্রবহমান ধারাকে প্রতিরোধ করে। মধ্যবিত্তশ্রেণী কিভাবে ক্রমে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলে শ্রমজীবীদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় সে-সম্বন্ধেও মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ বলেছেন যে সাধারণত দুটি কারণে এদের ভাঙন আরম্ভ হয়। প্রথম কারণ হল যে তাদের স্বল্প মূলধন বর্তমান যুগোপযোগী নয়, অর্থাৎ বর্তমান যুগে ব্যবসায় উন্নতি করতে হলে যতটা মূলধন থাকা দরকার তা তাদের নেই, এবং সেই কারণে তারা প্রচুর মূলধনের মালিক ধনিকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়। দ্বিতীয় কারণ হল এই যে বর্তমান যুগের উৎপাদন-প্রণালীর নিষ্পেষণে তাদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের কদর কমে যায়। এমনি করে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে ক্রমে একটি দল ভেঙে এসে শ্রমজীবীদের দলের সঙ্গে মিলিত হয়। মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ এ-কথাও বলেছেন যে প্রাচীন যুগে যেমন অভিজাত সম্প্রদায়ের একদল বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তেমনি এ-যুগের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যস্থিত একদল এই শ্রমজীবীশ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেবে। বুর্জোয়া-শ্রেণীর মধ্যস্থিত এই দল বলতে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি অংশকে ইঙ্গিত করেছেন। "কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো"র মধ্যে বলা হয়েছে যে বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্য থেকে যে-দল শ্রমজীবীশ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেবে তারা বিশেষ করে বৈপ্লবিক আদর্শ ও ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনবাদ ভালভাবে বুঝেছে। এ-উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমরা প্রমাণ পেয়েছি। রুশ-বিপ্লবের নজীর বাদ দিলেও দেখা যায় যে ইউরোপে মধ্যবিত্তদের একদল শ্রমজীবীশ্রেণী সংগ্রামের আদর্শ উপলব্ধি করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এমনকি একদল শিল্পী ও সাহিত্যিকও আজ শ্রমজীবীশ্রেণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে রূপ দিচ্ছেন। পূর্বে বলেছি যে মধ্যবিত্তদের সামনে আজ মাত্র দু'টি পথ উন্মুক্ত রয়েছে,—একটি নৈতিক

অবনতির ভিতর দিয়ে "ফিনান্স ক্যাপিটাল"-কে সমর্থন করে ফ্যাশিজম্-এর দিকে, আর একটি ধনিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংগ্রামমুখী সকলের সঙ্গে শ্রমজীবীশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য গণমহড়া গঠনের দিকে। প্রথম পথের যাত্রী হয়েছেন স্পেংলার, ওয়েলস্, হাক্সলে প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা; দ্বিতীয় পথের যাত্রী হয়েছেন, আঁদ্রে জিদ্, রোলাঁ, গুজাঁফাঁ, স্পেণ্ডর, ডে ল্যুইস্ প্রমুখ শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা। আরো পরিষ্কার করে বলতে হলে বলা যায় যে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রশস্ত পথে স্বচ্ছন্দে চলতে-চলতে আজ মধ্যবিত্তশ্রেণী, শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা তিনটি পথের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন,—একদিকে প্রাচীন বুর্জোয়ার পথে ফিরতে হবে, অর্থাৎ ফ্যাশিজম্কে আলিঙ্গন করতে হবে, একদিকে বেপরোয়া হয়ে একা বিশাল শূন্যতা ও হতাশার পথে আত্মগোপন করতে হবে, আর একদিকে বহুদূর বিসর্পিত প্রশস্ত সমাজতন্ত্রের পথ, যে-পথে আবার নূতন উদ্যমে, নূতন উৎসাহে অগ্রসর হতে হবে। এ ভিন্ন আর অন্য কোনো পথ নেই।

বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পীদের ব্যক্তিগত শ্রেয়োবুদ্ধি, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বুর্জোয়া সভ্যতা আজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নাম করে সত্যকার স্বাধীনতাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে—"Bourgeoisdom . crucifies liberty upon a cross of gold, and if you ask in whose name it does this, it replies, 'In the name of personal freedom.' " * রাসেল, ফর্স্টার, ওয়েলস্ প্রমুখ য়্যুরোপের বিখ্যাত মনীষীরা অভিযোগ করছেন যে সামাজিক সম্বন্ধই মানুষের পরাধীনতার কারণ, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করে সমাজ-ব্যবস্থা। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এ-কথার অর্থ এই হয় যে অসামাজিক যারা, অর্থাৎ জঙ্গলের পশুরাই একমাত্র স্বাধীন, কারণ কোনো সামাজিক বন্ধনই তাদের স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্তিকে বাধা দেয় না। স্বাধীনতার এই সংজ্ঞার প্রধান সমর্থক ছিলেন রুশো—"Man is born free but is everywhere in chains"—এবং স্বাধীনতার সেই স্বপ্নরাজ্য আজো বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়ার আওতায় লালিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ছাড়তে পারেনি। কিন্তু স্বাধীনতার স্বরূপ কি তাই? তাই যদি হয় তাহলে যেদিন থেকে

* Christopher Caudwell-এর "Studies in a Dying Culture" নামক পুস্তকের অষ্টম অধ্যায় (Liberty) পঠিতব্য।

সমাজের জন্ম হয়েছে সেদিন থেকে মানুষ পরাধীনতাকে বরণ করে পশুর চাইতেও অধম হয়েছে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু কেমন করে তা স্বীকার করব, মানুষ তো বাস্তবিক তা হয়নি। সমাজ অন্তর্গত মানুষই পশুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। এই সমাজের প্রধান ধর্ম হল অর্থনৈতিক উৎপাদন। একা মানুষ তার চাহিদা মেটাতে পারে না, সেইজন্য তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সে সহযোগিতা করে। এই সহযোগিতার মধ্যেই সে স্বাধীনতা লাভ করে। যার সাহায্যে মানুষ বহির্জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হয় সেই বিজ্ঞান সেইজন্য সামাজিক। যার দ্বারা মানুষ অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হয় সেই শিল্পও (Art) সামাজিক। যার দ্বারা মানুষের অনুভূতির সঙ্গে, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের সঙ্গে বহির্জগতের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, সেই অর্থনৈতিক উৎপাদনই বিজ্ঞান ও শিল্পের জনয়িতা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্যই মানুষ স্বাধীন এবং মানুষের সঙ্গে জঙ্গলের পশুর প্রভেদ। কড্‌ওয়েল বলেছেন: "Thus freedom of action, freedom to do what we will, the vital part of liberty, is seen to be secured by the social consciousness of necessity, and to be generated in the process of economic production. *The price of liberty is not eternal vigilance, but eternal work*".

কর্তব্য ও সুযোগসুবিধার ভিত্তির উপর যে সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল, বুর্জোয়াবিপ্লব তাকে ধ্বংস করে অর্থের সম্পর্কে পরিণত করল। বুর্জোয়া তার ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উৎপাদন করে। অতএব তাকে বাজারের জন্য উৎপাদন করতে হয়, ব্যবহারের জন্য নয়, কারণ বাজারের প্রতিযোগিতায় মুনাফা মেলে। বুর্জোয়ার সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্বের একমাত্র মাপকাঠি হল টাকা। সমস্ত সামাজিক বন্ধনের, স্নেহের, প্রেমের, প্রীতির, মূলগ্রন্থি হল টাকা। সামাজিক সম্পর্কের এই শৈথিল্যের ফলে বুর্জোয়ারা যে-স্বাধীনতা লাভ করল সে হচ্ছে ভুয়ো স্বাধীনতা, পশুর স্বাধীনতা। জঙ্গলে পশু নিজের জন্য পরিশ্রম করে, সংগ্রাম করে, বুর্জোয়ারাও নিজের মুনাফা লাভের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। কিন্তু জঙ্গলের পশু যে অর্থে স্বাধীন নয়, সেই মানুষিক অর্থে বুর্জোয়াও স্বাধীন নয়। সূচনা থেকেই বুর্জোয়া-স্বাধীনতার ভিত্তি সেইজন্য মিথ্যা ও ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সম্পত্তিলাভের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণী সমাজকে দুভাগে ভাগ

করল। সমাজের মধ্যে একদল হল নিঃস্ব, আর একদল হল সমস্ত সম্পত্তি ও মূলধনের মালিক। এই নিঃস্বরা যদি বুর্জোয়া-স্বাধীনতার সংজ্ঞানুসারে নিজেদের ইচ্ছামতো মালিকদের মূলধন বলপূর্বক ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করত, তাহলে অরাজকতার সৃষ্টি হত। সে-অবস্থায় সমাজ অন্তর্ধান করত, এবং মানুষ সত্যই জঙ্গলের পশু হয়ে যেত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রারম্ভ থেকেই বুর্জোয়া-শ্রেণীর স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের ও ঘটনার বিরোধ রয়েছে। প্রথম থেকেই শক্তি প্রয়োগ করে বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। পুলিস, সৈন্য, আইন প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী নিঃস্বদের স্বাধীনতাদাবীর বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করেছে। এর চাইতে মিথ্যা, ভুয়ো ও ধাপ্পাবাজি আর কি হতে পারে? স্বাধিকারপ্রমত্ত বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বাধীনতার যে নূতন ব্যাখ্যা করল, সঙ্গে-সঙ্গে নিঃস্বরা যাতে সেই 'স্বাধীনতার' দাবী পেশ না করে তার জন্য প্রয়োজন হল অস্ত্র তৈরির, সৈন্য শিক্ষার, আইন প্রণয়নের। এই হল বুর্জোয়া-স্বাধীনতার স্বরূপ। নিজেরই পাতা ফাঁদে নিজে জড়িয়ে পড়ে মিথ্যা স্বাধীনতার ধূমল পরিবেশের মধ্যে বুর্জোয়ার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল।

আজ সেইজন্য সত্যই যাঁরা স্বাধীনতার প্রেমিক তাঁরা সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাবের জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন। কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষ অনেক বেশি স্বাধীন হবে, তখন যুদ্ধ থাকবে না, শোষণ, অত্যাচার, প্রতারণা, অর্থ নৈতিক সঙ্কট প্রভৃতি থাকবে না। মার্কস্ সেইজন্য বলেছেন

> The slavery of bourgeois Society is in appearance the greatest liberty, because it seems to represent the total independence of the individual, who mistakes for his own liberty the unrestricted movement, freed from all human shackles, of 'elements' alien to his life, such as property, industry, religion. etc,. whereas it is a matter rather of his total enslavement and the total loss of his humanity. —The Holy Family

বুর্জোয়া সমাজের যে-স্বাধীনতা সে হচ্ছে দাসত্বেরই ছদ্মবেশ। সমস্ত প্রকার বাধা-বিপত্তি ও যোগসূত্র ছিন্ন করে যে-স্বাধীনতা ব্যক্তির অবাধ ও অনিরুদ্ধ মুক্তির মধ্যে আশ্রয় সন্ধান করে, তার প্রকৃত রূপ হচ্ছে পরিপূর্ণ দাসত্ব ও মানুষিক অবনতি। পণ্ডিতমূর্খ ওয়েলস্ সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতার

খর্বতার বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ জানিয়েছিলেন তখন স্টালিন্ জবাব দিয়েছিলেন :

…There is not, there ought not to be any antagonism between the interests of the individual and of the collectivity. The two must be reconciled. Only the Socialist society can make room, in the largest measure, for individual interests. Socialist society represents, moreover, the only solid guarantee of the defence of individual's interest.—Stalin-Wells Talk

সমষ্টি ও ব্যক্তির স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী নয়, পরস্পরাপেক্ষিক। দুয়ের মিলন ঘটবেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজেই ব্যক্তিস্বার্থের সিদ্ধি সম্ভব, এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই ব্যক্তি-স্বাধীনতার আশ্রয়দাতা। এই সত্যকে আধুনিক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা যেদিন উপলব্ধি করবেন সেদিন তাঁদের চলার পথে আপাতপ্রতীয়মান প্রতিবন্ধক দূরে সরে যাবে। সেদিন তাঁরা কর্মমুখর ও গতিশীল জীবনের স্পন্দন অনুভব করবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

আমাদের কর্তব্য

তাহলে আমাদের কর্তব্য কি?

সংস্কৃতি ও শিল্প-সঙ্কটের যে-বিকৃত রূপ আজ প্রকট হয়ে উঠেছে, সেই রূপই কি মানব-সংস্কৃতির সত্যকার রূপ? নৈরাশ্য ও মৃত্যুচিন্তার পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে আমরা কি ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ব, আর বুর্জোয়াশ্রেণীর অকর্মণ্যতা ও অশুভবুদ্ধির জন্য বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীকে অভিসম্পাত দেব? সংখ্যালঘু একটি শ্রেণীর অন্যায়, অত্যাচার, অমানুষিকতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর আশা, আকাঙ্ক্ষার উপর কি কারণে, কোন্ শক্তির সাহায্যে শ্রেষ্ঠত্ব বা সত্যতা দাবী করতে পারে? দাবী করলেও সে-দাবীকে গ্রাহ্য করবার কি যুক্তিসঙ্গত মানবিক কারণ আছে?

আমাদের মনে, পৃথিবীর প্রত্যেক জীবন্ত মানুষের মনে, আজ এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। যে-সঙ্কট, যে-বিপদ ভয়ঙ্কর দানবীয় মূর্তিতে আজ আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত, সে-সঙ্কটের পিছনে রয়েছে চিরপ্রবহমাণ ইতিহাস-স্রোতস্বিনীর কল্লোল। সেই ঐতিহাসিক ধারার প্রবাহপথে যে সাময়িক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়, এ-সঙ্কট হচ্ছে সেই সাময়িক ঘূর্ণাবর্ত। আজ তাই সেই ঐতিহাসিক ধারার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। গতিশীল ঐতিহাসিক ধারাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করাই আজ আমাদের নৈতিক কর্তব্য।

বুর্জোয়াসভ্যতার জন্ম থেকে এই মৃত্যুর সময় পর্যন্ত যে-আবর্জনা পঞ্জীভূত হয়েছে পৃথিবীর বুকের উপর, পর্বত-প্রমাণ সেই আবর্জনা-স্তূপের সামনে আজ শিল্পীর হতবাক্ হয়ে থাকবার দিন নয়। নিচে যে মাটি রয়েছে, তার প্রাণশক্তি আজো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সূর্যকিরণের অন্তরালেও মাটির বুক থেকে রস নিঙড়ে পান করে সেখানে যে-সব বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, সূর্যকিরণের স্পর্শের জন্য তাদের সামনের আবর্জনা-প্রাচীর ধূলিসাৎ করা কর্তব্য। সভ্যতার সাময়িক দুর্যোগান্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শিল্পীর উচিত নয় মানুষের চিরস্পন্দমান প্রাণশক্তিগুলিকে অবজ্ঞা করা। এই বিপুল প্রাণশক্তিকে শিল্পী যখন উপলব্ধি করতে পারবেন, তখন নৈরাশ্যের মসীলিপ্ত জীবনের পশ্চাতে তিনি গতিশীল চির-অগ্রাভিমুখী মানবজীবন ও মানবসভ্যতার সন্ধান পাবেন। আজ জীবনের

সেই স্পন্দমান প্রাণশক্তিগুলিকে (Elemental Forces of Life) উপলব্ধি করতে চেষ্টা করাই হবে আমাদের অবশ্যপালনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

জীবনের এই গতিশীল প্রাণশক্তিগুলির সঙ্গে সভ্যতার, শিল্পের ও সংস্কৃতির অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ নির্ণয় করবার জন্য আমি টলস্টয় সম্বন্ধে লেনিনের সমালোচনা এবং রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক লেনিনের সমালোচনার সমালোচনা উদ্ধৃত করব। শিল্পীর আদর্শ, শিল্পীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে এত গভীরভাবে বিশ্লেষণ আমি আর কোথাও পাইনি। শিল্পী টলস্টয় সম্বন্ধে লেনিন বলেছিলেন

It may seem at the first glance strange and artificial to link the name of Tolstoi with that of the Revolution, from which he very evidently turned away. But our Revolution (of 1905) was an extremely complicated phenomenon ; in the rank and the file of its participants and leaders there were many social elements which did not understand what was happening and averted themselves from the real historical tasks posed by the development of events. In this sense, the divergent ideas of Tolstoi are a veritable mirror of the contradictory situation in which the historic activity of the peasantry of our revolution found itself. The originality of Tolstoi and his ideas in general express justly the varied phases of our revolution in as much as they *reflect the revolution* of the peasant bourgeoise and the revolt of the critics of capitalist exploitation. The denunciation of the violences of the state and the comedy of the courts, the glaring contrast between the increase of riches which go hand in hand with the conquests of civilisation and the increase of misery and barbarism which grow with the tortures of the working masses. And surmounting this we have the preaching of the 'Saint-Idiot' for non-resistance of evil by violence ..... Tolstoi reflected the hate born from sufferances, the ripened desire for a better future, the desire to liberate himself from the immaturity of dreams, the lack of political education, and the weakness of the revolutionary desire. These historic-economic conditions show the preparation necessary for the

struggles of the revolutionary masses and their lack of preparation for such a struggle. The Tolstoian doctrine of non-resistance to evil was the most serious of the causes which led to the defeat of the revolutionary campaign. —Lenin on Leon Tolstoi.

"বিপ্লবের সঙ্গে টলস্টয়-এর নাম একত্রে উচ্চারণ করলে প্রথমে একটু আশ্চর্য মনে হতে পারে। কিন্তু ১৯০৫ সালের বিপ্লব অত্যন্ত জটিল ব্যাপার ছিল। সে-বিপ্লবে যেসব জনসাধারণ ও নেতৃবর্গ যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে আদৌ সচেতন ছিল না, এবং সেইজন্য পরিবেষ্টনের নির্দেশ অনুসারে তারা সত্যকার বিপ্লবী ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করতে পারেনি। এই দিক থেকে টলস্টয়-এর বিভিন্নমুখী ভাবধারাকে বিপ্লবের বিরোধী পরিবেশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত কৃষকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ক্রিয়ার প্রতিবিম্বস্বরূপ বলা যেতে পারে। টলস্টয়-এর অভিনব ভাবধারার মধ্যে বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরের আন্তরিক রূপ অভিব্যক্ত হয়েছে, এবং তার মধ্যে, বুর্জোয়া-কৃষকশ্রেণীর বিপ্লব ও ধনতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত রূপায়িত হয়েছে। রাষ্ট্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে, একত্রে ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সভ্যতার জয় এবং জনগণের অভাব অভিযোগ,—দু'টি দিকই টলস্টয় প্রকাশ করেছিলেন। সব প্রকাশের উপর ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ ও প্রতিরোধের প্রতি 'নির্বুদ্ধি-সাধু' টলস্টয়-এর বিতৃষ্ণা। উৎপীড়ন-জাত ঘৃণা, সুন্দরতর ভবিষ্যতের প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নময় তন্দ্রালুতা, রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব, বিপ্লবী মনোভাবের দুর্বলতা,—এইসব ছিল টলস্টয় এর বৈশিষ্ট্য। এই ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যায়, এবং সে-সংগ্রামের প্রস্তুতির অভাবও পরিলক্ষিত হয়। বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরাজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ ছিল টলস্টয়-এর অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক প্রতিবাদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা।"

শিল্পী টলস্টয়-এর উপর লেনিনের এই সমালোচনা সম্বন্ধে বিশ্ববরেণ্য ফরাসী শিল্পী ও মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁ বলেছেন

This judgment of Lenin which applies to a great artist of a definite epoch can be verified with other masters of other epochs, especially the pre-revolutionary epoch of our 18th century France. It is exactly that which happened···Not

more than Tolstoi, did Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, and the Encyclopedists understand what was going to happen and of which they were nevertheless the heralds. They have done nothing more than to translate (not without errors) in a striking form···the people of their time, and follow with them, confusedly, the slope over which all of the 18th century was dragged. But they were far from suspecting where this slope was to lead them and if they perceived it... they all (with the exception of the adventurous Diderot) would have dropped to the rear. The 19th century Frenchmen did not clearly see the next stage where the entire development of history would change its course and set out fatally, as Lenin perceived it. For the historian of literature the interest should be to precisely discern that which the Rousseaus, the Diderots, and the Voltaires were aware of without thoroughly understanding. It is the sketch which Lenin with his brusque and comradely frankness drew of a writer whom he loved which exposed how Leon Tolstoi genially denounced the lies and the offenses of the social state, but how in the face of revolutionary action, which was the inequitable consequence, protested with fear and anger, shouting 'No', taking refuge in mysticism which wished to stop the progress of the sun by denying it.

"একটি বিশিষ্ট যুগের একজন মহৎ শিল্পী সম্বন্ধে লেনিনের এই সমালোচনা অন্য যুগের শিল্পী সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের প্রাক্-বৈপ্লবিক যুগের শিল্পীদের সম্বন্ধে। তাঁদের ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ একই ব্যাপার ঘটেছিল। মোঁতেসকো, ভল্টেয়ার, রুশো, ডিডেরট্ বা এন্সাইক্লোপিডিস্টরা, কেউই টলস্টয়-এর চেয়ে বেশি বুঝতে পারেননি ভবিষ্যতে কি ঘটবে, অথচ তাঁরাই ছিলেন তার অগ্রদূত। তাঁরা নিখুঁতভাবে তৎকালীন মানুষের বর্ণনা করে গিয়েছেন (তাও ভুল করে), এবং যে-পথে অষ্টাদশ শতাব্দী অগ্রসর হয়েছিল সেই পথই অনুসরণ করেছিলেন, তাও সম্পূর্ণ সজ্ঞানে নয়। যদি তাঁরা বুঝতে পারতেন যে সে-পথের শেষ কোথায়, তাহলে হয়তো অনেক পিছনে তাঁরা পড়ে থাকতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসীরাও জানতেন না, ঐতিহাসিক বিকাশের পরবর্তী স্তর কি, এবং সেইজন্য লেনিনের কথানুযায়ী

তাঁরাও বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের পরিষ্কারভাবে বিচার করে দেখা উচিত যে রুশো ও ভল্‌টেয়ার যা জানতেন অথচ উপলব্ধি করতে পারেননি, তা কি? লেনিন অতি সরলভাবে তাঁর প্রিয় শিল্পী টলস্টয় সম্বন্ধে বলেছেন যে সমাজের মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু সেই প্রতিবাদের ন্যায্য পরিণতি বিপ্লবের কথা উঠলেই ভয়ে ও ক্রোধে বলেছেন 'না' এবং গূঢ়ত্ব ও রহস্যের মধ্যে আত্মগোপন করে প্রগতিকে অস্বীকার করেছেন।"

রোলাঁ বলেছেন যে শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে লেনিনের এই বিশ্লেষণ আধুনিক শিল্পীদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন

This phenomenon is found in a smaller degree and with less passion in the large majority of artists who see the pit, the abyss which it is necessary to jump, but who from this perspective grow dizzy and sever their allegiance. To re-establish their fragile, shaken equilibrium, they bend backward out of the wave which sweeps the epoch, into the 'moral' order, the established bourgeois order which reassures them against that which they have seen and which they did not wish to see,—into the conventional and ordered life.

আধুনিক শিল্পীদের মধ্যেও লেনিনের উল্লিখিত টলস্টয়-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ শিল্পী সামনের গহ্বর দেখতে পান স্পষ্ট, বুঝতেও পারেন যে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রয়োজন, কিন্তু সে-প্রয়োজনীয়তার চিন্তাতেই তাঁরা অবশ হয়ে পড়েন এবং দায়িত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে শান্তি পান। তারপর সেই অবসন্ন, পঙ্গু মনের সাম্য বজায় রাখবার জন্য, যুগের বুকের উপর দিয়ে যে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে তার উপর থেকে পিছন ফিরে তাকান, প্রাক্তন বুর্জোয়াজীবনের শৃঙ্খলা, বিশ্বাস, ও শান্তি ফিরে পেতে চান। এলিয়ট্, পাউণ্ড, লরেন্স, হাক্স্‌লে, প্রুস্ত্, জয়স্, সকলেই এই গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু লেনিনের মতো "Master of action" যাঁরা, যুগধারার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের এক ভাবেন, এবং সেইজন্য তার অন্তর্লীন চিরজীবন্ত প্রাণশক্তিগুলিকে উপলব্ধি করে ভবিষ্যৎ যুগের পথ সুগম করেন। শিল্পী হিসাবে রোলাঁ ও গোর্কি কর্মী লেনিনের সমপর্যায়ভুক্ত।

বিপ্লবের আতঙ্কে সন্ত্রস্ত একজন কমরেড্ একবার লেনিনকে বলেছিলেন :

"After the Revolution, the normal order ought to be established"—বিপ্লবের পরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা উচিত। লেনিন বিদ্রূপ করে এ-কথার জবাব দিয়েছিলেন: "It is unfortunate when people who pretend to be revolutionaries forget that the most normal order of history is the order of Revolution" —সত্যই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যাঁরা নিজেদের বিপ্লবী বলে পরিচয় দেন তাঁরা ভুলে যান যে ইতিহাসের স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে বৈপ্লবিক অবস্থা। লেনিনের এই ইতিহাসের জ্ঞান সম্বন্ধে স্টালিন্ বলেছেন: "This profound faith in the *elemental forces*, which was characteristic of Lenin, gave him the power to control these forces and direct their flow into the channels of the great Proletarian revolution." প্রাণশক্তির উপর এই প্রগাঢ় বিশ্বাসই ছিল লেনিনের বৈশিষ্ট্য, এবং এরই জন্য তিনি সেই শক্তিগুলিকে আয়ত্তে এনে তাদের শ্রমজীবী-বিপ্লবের পথে নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কর্মী ও জননায়কদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তাঁরা প্রত্যেক বিষয়ের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারেন এবং সেখান থেকে গুপ্ত শক্তিগুলিকে আবিষ্কার করে মানবকল্যাণের জন্য তাদের নিয়োগ করেন। লেনিন বলেন যে শিল্পীরও সেই একই শক্তি থাকা উচিত। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন: "Thus the great artists, the Leonardos and the Tolstois espoused the living forms of nature. And the masters of action, the Lenins, correlated the laws of society and its rhythm, the *vital elan* which directs and supports the everlastingly onward march of humanity." লেনিন-নির্দিষ্ট শিল্পের এই 'supreme rule', রোলাঁ বলেন, "if the majority of artists have been too weak to accept it, the great ones have always unconsciously practised it."

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের ও মানুষের এই "elemental force"-গুলিকে উপলব্ধি করে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা। সামাজিক সমস্যাগুলির বাহ্যিক রূপই আসল রূপ নয়, সেই বাহ্যিক রূপের অন্তরালে যে প্রাণশক্তি আছে, স্পন্দমান প্রাণের যে গতিশীল জীবন্তরূপ আছে, তাই হচ্ছে আসল রূপ, বাস্তব তাকে বলে, তাকে বলে সত্য। ভাসমান সমস্যার মর্মস্থলে প্রবেশ

করে সেই প্রাণশক্তির সন্ধান করা, এবং তাকে অন্তরে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করে রূপায়িত করাই শিল্পীর কর্তব্য। সেই রূপায়ণকে বলে বাস্তব-সৃষ্টি, সত্য-সৃষ্টি, এবং শিল্পী হচ্ছেন সেই বাস্তব ও সত্যের স্রষ্টা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ-যুগের "elemental forces" কি? আধুনিক শিল্পীদের নৈরাশ্য ও অবিশ্বাসের মধ্যে কি গুপ্ত শক্তির ক্রিয়া দেখতে পাই? কোনো শিল্পী শান্তি চান, এবং বর্তমান সঙ্কটের মধ্যে শান্তির আশা না পেয়ে তিনি ফিরে যেতে চান মধ্যযুগের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে। কেউ ভাবেন অবিশ্বাসই সকল অনিষ্টের মূল, মানুষ আজ বিশ্বাস হারিয়েছে বলে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হয়েছে, এবং এ-যুগে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার মতো কিছু নেই, তাই তিনি গির্জার অভ্যন্তরে যেতে চান। কেউ চান শান্তিতে থেকে নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপভোগ করতে, নিজের প্রতিভা-বিকাশের পথ সুগম করতে, এ-যুগের জঘন্য পরিবেষ্টনে তা সম্ভব নয়, তাই তিনি কল্পনায় আইভরি মিনারে প্রত্যাবর্তন করে আত্মতৃপ্তির বিলাসিতায় মগ্ন হতে চান। কেউ এ-যুগের অত্যাচার, ব্যভিচার ও অনাচারকে ঘৃণা করেন মনেপ্রাণে, এবং মুক্তির কোনো পথ না পেয়ে শুধু নির্মম কশাঘাত করেন, আর না হয় ভীষণ নৈরাশ্যের অন্ধকারে আত্মগোপন করে মৃত্যু কামনা করেন।

এই পরাভব ও পরিত্রাণের মনোভাবের পিছনে যে-শক্তি সাক্রয় রয়েছে, সে হচ্ছে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষা। শান্তি, সৌন্দর্য, স্বাধীনতা, বিশ্বাস, সকলের কাম্য। এ-যুগে সে-কামনা পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা নেই বলে কেউ ক্যাথলিক্ গির্জায়, কেউ মধ্যযুগে, কেউ মৃত্যুতে, কেউ কল্পনার আইভরি মিনারে তার সার্থকতা সন্ধান করেন। এ-যুগেই সে-কামনা চরিতার্থতার জন্য যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তার জন্য যে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছে, এবং আজও করছে, আজ শিল্পীর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি বলেই এই মানসিক বিপর্যয়। অর্থাৎ শিল্পীর অন্তরের সুপ্ত প্রাণ-শক্তিই যে বাইরে পৃথিবীর বুকে ক্রিয়াশীল, তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি যে-শান্তি চান, যে-সৌন্দর্য, যে-স্বাধীনতা, যে-বিশ্বাস, যে-নিরাপত্তা কামনা করেন, এ-যুগের সঙ্কটের মধ্যে আজ তারই জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছে, এ-যুগের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী শ্রমজীবীশ্রেণী আজ সেই একই দাবী নিয়ে সমাজতন্ত্রের মধ্যে তার পরিতৃপ্তির জন্য বিপুল বিশ্বাসে অগ্রসর হয়েছে। মধ্যযুগে, ক্যাথলিক্ গির্জায় বা আইভরি মিনারে প্রত্যাবর্তনে প্রয়োজন কি?

ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ ধ্বংসোন্মুখ সত্য, কিন্তু রুশ-বিপ্লবের পর পৃথিবীর কিনারে-কিনারে যে বিপ্লবের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল, যে নূতন সমাজতান্ত্রিক জীবনের, নূতন সভ্যতার, নূতন সংস্কৃতির বজ্রবাণী পৃথিবীর রুদ্ধ দ্বারে-দ্বারে আঘাত করল, সে কি আরো বৃহত্তর সত্য নয়? যে-সত্যের আহ্বানে মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠীকে সমাজের যাদুঘরে পরিত্যাগ করে, পৃথিবীর বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী বেরিয়ে এল প্রাচীন সমাজের লৌহ প্রাচীর ধূলিসাৎ করে নূতন সমাজ গঠনের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে, সে-বাণী কি আরো জীবন্ত ও সত্য নয়? সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও ফ্যাশিজম্-এর নির্লজ্জ উদ্ধত অমানুষিকতার মধ্যে যে ধনিকসভ্যতা সাম্য, শান্তি, স্বাধীনতা, বিশ্বাস, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা প্রভৃতিকে নির্মূল করতে সঙ্কুচিত হল না, এবং তারই সামনে যখন নূতন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা মুখোমুখী এসে দাঁড়াল তাকে ধূলায় লুণ্ঠিত করে মানুষের ন্যায্য দাবীর যোগ্য সম্মান দেবার জন্য, তখন মানবসভ্যতাকে 'বিনিপাত' কেন বলব, কেন এক দুর্বল শ্রেণীর দুষ্কর্মের জন্য দায়ী করব সবল, সজীব, সংখ্যাগরিষ্ঠ আরএক শ্রেণীকে। বরং বিশ্বাসঘাতক যে, অত্যাচারী যে, সেই ধনিকসভ্যতাকে পথের ধূলায় গুঁড়িয়ে ফেলে, যে মানব-সেনাবাহিনী আজ সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করেছে, তাদেরই উৎসাহ দেব আমরা, তাদেরই সহযাত্রী হব। আমাদের কণ্ঠে সেই সুরে বিপ্লবের সঙ্গীত ধ্বনিত হবে, সাম্যবাদের মহাতীর্থের পথে আমরাও অগ্রগামী গণবাহিনীর অনুগামী হব।

সাম্য, স্বাধীনতা, বিশ্বাস, নিরাপত্তা, শান্তি, শৃঙ্খলা—এইগুলি হচ্ছে বর্তমান সমাজের "elemental forces", এবং উপরের পরাধীনতা, বৈষম্য, অবিশ্বাস, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার খোলসটিকে বাদ দিয়ে ভিতরের এই গুপ্ত শক্তিগুলিকে প্রকাশ করাই হবে বর্তমান যুগের শিল্পীর কর্তব্য। এই গুপ্ত-শক্তির বিকাশ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাবেই সম্ভব। এ-যুগের শিল্পীকে তাই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হতেই হবে।

বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পঁচিশ বছর পর আজ যে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, তার মধ্যে আমরা একদিকে অনুভব করেছি বিপুল সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক শক্তির প্রাণস্পন্দন, আর একদিকে শুনেছি ধনিক-সভ্যতার প্রাচীন ইমারত ধসে পড়ার শব্দ। রাশিয়ায় স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের

ধ্বংসলীলার পাশাপাশি দেখলাম বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের বিজয় অভিযান। য়্যুরোপ সে-বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। ইতালী ও জার্মানিতে দেখলাম নপুংসক, শান্তিবাদী সমাজতান্ত্রিকদের বিপ্লব-বিরোধী পরাভব-মনোবৃত্তির জন্য ফ্যাশিজম্ ও নাৎসীজম্ প্রতিষ্ঠিত হল। তারপর দেখলাম ফ্যাশিজম্-এর সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যক্ষুধা, আর সেই ক্ষুধার প্রতি তার বৈমাত্রেয় ভাই সাম্রাজ্যবাদের বিপ্লবাতঙ্কজাত সহানুভূতি। আজ দেখছি ভাইয়ে-ভাইয়ে প্রাণ-সংহারের কলহ বেধেছে, সুতরাং ধনিক পরিবারের যে ভাঙন ধরেছে, তার ধ্বংস যে অনিবার্য, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? ধনিকগোষ্ঠী যে বিপ্লবাতঙ্কে আজ জর্জরিত, সেই বিপ্লবাকাঙ্ক্ষাই তো এ-যুগের প্রাণশক্তি। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীশ্রেণী ও প্রগতিশীল বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীকে যে-শক্তি আজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অদম্য সাহস ও অফুরন্ত অনুপ্রেরণা দিচ্ছে, এ-যুগের সেই "elemental force"-কে নির্ভয়ে প্রকাশ করা ভিন্ন মহৎ শিল্পীর আর কি শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব থাকতে পারে?

ভারতবর্ষের মতো পরাধীন দেশে আজ সেই একই শক্তি অন্তরালে সক্রিয় রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের সোনার মসনদ যখন কম্পমান, তখন শ্রেণী-নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। সঙ্গে-সঙ্গে স্বৈরাচারী সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজ্যের নিপীড়িত প্রজাবৃন্দের সংগ্রাম, জমিদারী-প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং ধনিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমজীবীশ্রেণীর সংগ্রাম প্রবল হয়ে উঠেছে। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর সংগ্রামের মধ্যে ভারতের কৃষক ও শ্রমজীবীশ্রেণীর ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য বৈপ্লবিক প্রস্তুতি হচ্ছে বর্তমান ভারতবর্ষের "elemental force", এবং এই প্রাণশক্তি ভারতের সামাজিক জীবনেও মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন সংস্কারের ও ধর্মের নাগপাশ ছিন্ন করে, ভারতীয় সমাজের অন্তরে আজ যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, তার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাচীন সামাজিক জীবনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে। ভারতের এই "elemental force"-গুলিকে রূপায়িত করাই হবে এ-যুগের ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিকের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার তোরণ অতিক্রম করে, সমাজতন্ত্রের দিকে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর সহযাত্রী হতে হবে বর্তমান ভারতের শিল্পীকে।

এই হল শিল্পীর কর্তব্য, বাস্তবকে উপলব্ধি করে যিনি বাস্তব সৃষ্টি করবেন, চিরস্পন্দমান প্রাণশক্তিকে অনুভব করে যিনি মানবসভ্যতার অগ্রগতির সহায়তা করবেন। আর যাঁরা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে, দিনের অন্যায়, দিনের অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, প্রত্যেকটি দিন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, মানুষের সংগ্রামে সাহায্য করেন, সেই সাংবাদিকদেরও আজ কম দায়িত্ব নেই। লেখনীর কিরীচ নিয়ে যাঁরা সৌন্দর্যের ও স্বাধীনতার সিংহদ্বার আজ আগলে থাকবেন, তাঁদেরও আজ আংশিকভাবে এই দৈনন্দিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। শিল্পীর চেয়ে সাংবাদিকের দায়িত্ব আজ কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শত্রুপক্ষ ধনিকগোষ্ঠী যখন বহুদিনের সুসজ্জিত সমরোপকরণ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তখন সেই সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য আমাদের শক্তিকেও সংহত করতে হবে। বিচ্ছিন্ন ছত্রভঙ্গ সংগ্রামে শুধু হতাশাই বাড়বে। একদিকের প্রচার-বিভাগ যখন কঠিন সতর্কতার সহিত কাজে ব্যস্ত, বুর্জোয়াশ্রেণীর রক্ষিত ভাড়াটিয়া সাংবাদিকেরা যখন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করছে, তখন আমরাও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকব না। আমাদের প্রতিবেশী চীন থেকেই এর জলন্ত দৃষ্টান্ত পেতে পারি। চীনে সাম্রাজ্যবাদী জাপান যে উন্মত্ত ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়েছে, চীনের সমস্ত জনগণ শ্রেণীনির্বিশেষে একত্রীভূত গণমোহড়া গঠন করে শুধু যে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তা নয়, চীনের লেখকরাও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ-প্রতিরোধের জন্য একত্রে সংগ্রাম করছে। আজ চীনের লেখকেরা চীনের সংগ্রামরত জনগণের অনুপ্রেরণার উৎসস্বরূপ।

য়ুরোপের প্রগতিশীল শিল্পীরাও জনগণের সঙ্গে একত্রে ফ্যাশিজম্-বিরোধী মোহড়ায় সংগ্রাম করেছে। ভারতের শিল্পী ও সাংবাদিকদেরও আজ অনুরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোহড়ায়, ভারতীয় লেখকদেরও উচিত, যোগ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে শক্তিশালী করা এবং সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে প্রকাশ করা। এ-দায়িত্বকে অবহেলা করলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

বর্তমানে এই হচ্ছে আমাদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

—

সংযোজন : ক / জুন ১৯৮০

কেন লিখি ? কার জন্য লিখি ?

কেন লিখি ? কেন ছবি আঁকি ? কেন গান গাই ? একই প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, যদি অবশ্য উত্তর ঠিকমতো দিতে হয়, অনেক কথা বলতে হয়। বেশি কথা একটি ছোট নিবন্ধের মধ্যে বলা সম্ভব হবে না, তাই অল্প কথায় বিষয়টা নিজে লেখক হিসেবে বুঝতে এবং অন্যদের পাঠক হিসেবে বোঝাতে চেষ্টা করব। চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা কম কারণ অল্প কথায় গুরুবিষয় বলতে গেলে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা বেশি।

গত প্রায় চল্লিশ বছরের লেখক-জীবনে খুব কম করেও অর্ধশতাধিক লেখক চিত্রশিল্পী ও সুরশিল্পীদের সঙ্গে বিভিন্ন পরিবেশে এই বিষয়ে আলাপ-পরিচয় করে দেখেছি, একজনের উত্তরের সঙ্গে অন্যের উত্তরের বিশেষ মিল নেই। মিল না থাকলেও উত্তরগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একদল লেখক-শিল্পী মনে করেন যে সাহিত্য-শিল্পের চর্চা করে অর্থাৎ লিখে বা ছবি এঁকে বাইরের কোলাহল দায়দায়িত্ব চিন্তাভাবনা ইত্যাদি থেকে বেশ পালিয়ে যাওয়া যায়। নিজের একটি নিভৃত নির্জন কোণ বেছে নিয়ে সেখানে বসে মনের মতো লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়। আরএক দল বলেন, না তা যায় না, নিভৃত নির্জন কোণ তৈরি করা যায় না। বাইরের কোলাহল থেকে পালিয়ে যাওয়া যায় না। বাইরের দায়দায়িত্ব চিন্তাভাবনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। নির্জন কোণে তারা হামলা করে। জেগে ঘুমাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়, আর বারংবার ঘুম ভেঙে যায়। অতএব পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। কোথায় পালাবো ? এই এক হতে পারে যদি মানুষের কাছ থেকে, সমাজের কাছ থেকে, বহুদূরে এমন কোনো গভীর জঙ্গলে চলে যাই, যেখানে মানুষের বসবাস নেই, মানুষের সমাজ নেই, তাহলে নির্জন কোণে বসে লেখা যায়, ছবি আঁকা যায়। কিন্তু তখন আবার সমস্যা দেখা দেবে, কি লিখব, কাকে নিয়ে লিখব ? বনমানুষ ? বুনো শুয়োর ? বন্য ভাল্লুক ? বানর-হনুমান ? তাই এঁরা বলেন যে সমাজ থেকে, মানুষের কাছ থেকে পালাবার উপায় নেই। সমাজ ও মানুষের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং তার ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হলেও লক্ষ্য হবে জয়ী হওয়া।

এই দুই দলের বক্তব্যের উত্তরে প্রথমেই বলা যায়, পলায়ন যে কেবল গভীর জঙ্গলে অথবা হিমালয়ের পাদদেশে করা যায় তা নয়, পাগল হয়েও পালানো যায়, মৃত্যু বরণ করেও পালানো যায়। যাঁরা সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে জয়ী হবার কথা বলেন তাঁরাও বিলক্ষণ জানেন যে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া সংগ্রাম করা যায় না এবং কলমকে যতই আমরা তলোয়ারের চেয়ে শক্তিশালী বলি না কেন, যখন কোনো সৈনিক তলোয়ার নিয়ে সেই শক্তিশালী লেখনীধারককে শিরচ্ছেদ করতে আসে তখন কলম দিয়ে তা প্রতিরোধ করা যায় না, তলোয়ার দিয়ে করতে হয়।

কিন্তু কেন লিখি তার উত্তর এর মধ্যে পাওয়া গেল না। পালিয়ে যাওয়া অথবা আত্মচিন্তায় বুঁদ হয়ে থেকে সেই ভাব প্রকাশ করা যদি লেখার উদ্দেশ্য হয় তাহলে LSD বা যে-কোনো ট্র্যাঙ্কুলাইজার খেয়ে তা করা যেতে পারে। তার জন্য লিখতে হবে কেন? সংগ্রাম যদি করতে হয় তাহলে অস্ত্র নিয়ে তা করাই ভাল, লেখনীর প্রয়োজন কি? কাজেই আমরা লিখি অন্য কোনো কারণে। আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে বাস করি, মানুষ হিসেবে সামাজিক পরিপার্শ্ব থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করি, চোখে দেখি, কানে শুনি, বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করি, হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। যা-কিছু এইভাবে আমরা মানুষ হিসেবে মানুষের মধ্যে থেকে গ্রহণ-বর্জন করি, তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমরা লিখে প্রকাশ করতে চাই। মুখে প্রকাশ করলে কথক কবিয়াল বা আধুনিক বক্তা হতে হত। লিখে প্রকাশ করি বলেই আমরা লেখক। প্রকাশ করি এইজন্য যাতে পাঠকরা আমার মনের ভাবানুভাব, আমার অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে বিচার করার রীতি ও ভঙ্গি ইত্যাদি জানতে পারে, অর্থাৎ Communicate করাই লেখকের উদ্দেশ্য। 'The writer is, *par excellence*, a mediator and his commitment is to mediation' (Sartre).

অনেক লেখক বলেন যে তিনি লেখেন তাঁর নিজের জন্যে, কে পড়ল না পড়ল তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। এটা একেবারে মিথ্যে কথা। এমন যদি হয় যে কোনো দেশে বা কোনো দ্বীপে লেখক একলা বাস করেন, তাঁর পরিবেশ জনমানবশূন্য, লেখার ক্ষমতা তাঁর অসীম. মনের চিন্তাভাবনা অফুরন্ত এবং গভীর। তিনি কি সেখানে বসে হাজার-হাজার পৃষ্ঠা লিখবেন? ধরে নিলাম লিখবেন, কিন্তু সেই লেখা কি তাঁর প্রকাশিত হবে? হবে না। কার জন্য হবে? তাঁর খেয়ালখুশিতে লেখা সেই হাজার-হাজার পৃষ্ঠা কীট-পতঙ্গের খাদ্য

হবে, যে কীট-পতঙ্গরা তাঁর মনের কথা একটিও বুঝতে পারবে না, অথচ তাঁর হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি খেয়ে হজম করে ফেলবে। সুতরাং 'আমার জন্য' লিখি এই মিথ্যাকথা আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করা উচিত। আমরা লিখি পাঠকদের কথা মনে করে। আমরা যেমন মানুষ, পাঠকরাও তেমনি মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাব আদান-প্রদানের জন্যই লেখা। লেখকের কাছে পাঠক 'dialectical correlative'-এর মতো। লেখার সময় মানুষ হিসেবে পাঠকরাও লেখকের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, যেমন লেখকরা মানুষ হিসেবে তাঁদের লেখার ভিতর দিয়ে পাঠকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। লেখা বা যে-কোনো শিল্পকলা সৃষ্টির মধ্যে এই যে 'আমি' শিল্পী এবং 'তারা' অনেকে যারা পাঠক-দর্শক-শ্রোতা, এই দু'য়ের মধ্যে যে ডায়লেক্‌-টিক্যাল সম্পর্ক থাকে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন। 'There is no art except *for and by others*' (Sartre)।

লেখক কি লিখবেন? মানুষ সম্বন্ধে বললে কিছুই বলা হয় না। মানুষের কোন বিষয় নিয়ে লিখবেন? লেখক যদি রাজপুত্র হন, অথবা উচ্চশ্রেণীভুক্ত যে-কেউ হন, তাহলে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি, তাঁর বিষয় সমস্যা ইত্যাদি যেরকম হবে, তা নিশ্চয় নিম্নশ্রেণীভুক্ত সাধারণ দরিদ্র কোনো লেখকের হবে না। দুজনের জগত আলাদা, অথচ দুজনের অভিজ্ঞতাই সামাজিক সত্য। কিন্তু সত্য হলেও দুই সত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাজপুত্র বা জমিদার বা উচ্চশ্রেণীর লেখকের অভিজ্ঞতা খুব সীমাবদ্ধ। সমাজের একজনও যেহেতু তাঁদের শ্রেণীভুক্ত নন সেইজন্য সমাজের নিরানব্বুই জনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট গরমিল থাকার কথা। তাহলে সত্য কোনটাকে বলব? শতকরা নব্বুইজনের মুখ দিয়ে যিনি কথা বলছেন এবং ১৮০টা হাতের প্রতিভূ একটি হাত দিয়ে যিনি লিখছেন, তাঁর কথা কি সামাজিক সত্য হিসেবে আরও অনেক বড় সত্য নয়? আমেরিকার নিগ্রো লেখকের মতো আমাদের দেশের কোনো হরিজন লেখক যদি ভারতীয় সমাজের নিদারুণ অবিচার অনাচার অত্যাচার সম্বন্ধে লেখেন এবং তাঁর লেখার মধ্যে যদি তিনি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে তাঁর মনের ঘৃণা ক্রোধ ও প্রতিহিংসার ভাব নির্মমভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তাহলে কি তাঁর লেখা মন্দ বা নিন্দনীয় বলে গণ্য হবে? কথাটা একটু ভাববার মতো। হয়ত হরিজন লেখকের শিক্ষাদীক্ষাচর্চা কোনো উচ্চশ্রেণীর লেখকের মতো পরিশীলিত না

হতে পারে, প্রকাশভঙ্গি ও ভাষার মধ্যে রূঢ়তা গ্রাম্যতা থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য তাঁর লেখা কি ব্যর্থ হবে? শ্রীচৈতন্যপন্থী অথবা বিনবাপন্থী অথবা করুণাময়ী মাদার তেরেজাপন্থী কোনো উচ্চশ্রেণীর সুশিক্ষিত লেখক সুন্দর মার্জিত ভাষায় যদি তাঁর ভাবনাচিন্তা খুব দক্ষ কলাকুশলীর মতো প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁর লেখা কি হরিজন লেখকের চাইতে কেবল কলাকুশলতার জন্য উৎকৃষ্ট বলে স্বীকার করতে হবে? হরিজন লেখক ঘৃণা ও হিংসার ভাব প্রকাশ করেন এবং বিদগ্ধ উচ্চশ্রেণীর লেখক অহিংসা প্রেম প্রভৃতি উচ্চভাব প্রকাশ করেন। দুজনের মধ্যে সত্য প্রকাশের কৃতিত্ব কার এবং সাহস কার? সোজা উত্তর হল, হরিজন লেখকের। কারণ হরিজন লেখক যে সত্যকে সমাজের মানুষের কাছে প্রকাশ করতে চান, তার সত্যতা অন্য শ্রেণীর লেখকের তুলনায় শতগুণ বেশি। শুধু তাই নয়, হরিজন লেখক তাঁর জীবনের সত্যকে প্রকাশ করার জন্য যে স্বাধীনতার (freedom) আশ্রয় নিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর অসাধারণ সততা ও দুঃসাহস প্রকাশ পেয়েছে। রূঢ় ও অমার্জিত হলেও তাঁর লেখা থেকে বোঝা যায় যে তিনি জীবন পণ করে স্বাধীনভাবে লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। লেখকের কাছে এই স্বাধীনতাই শ্রেষ্ঠ কাম্য, যে স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়ে তিনি জীবনের ও সমাজের শ্রেষ্ঠ সত্য নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারেন। 'Thus, whether he is an essayist, a pamphleteer, a satirist, or a novelist, whether he speaks only of individual passions or whether he attacks the social order, the writer, a freeman addressing free man, has only one subject—freedom.' (Sartre)

লেখকের নিজের স্বাধীনতার সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বলা চলে এবং মানুষ মানে সমাজের অধিকাংশ মানুষ, মুষ্টিমেয় কয়েকজন দ্বিপদ ম্যামাল-মানুষ নয়। হরিজন-লেখক যখন নিপীড়িত শোষিত হরিজনদের প্রতি যুগ-যুগব্যাপী অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন, তখন হরিজনদের ভিতর দিয়ে সমগ্র নিপীড়িত মানবজাতির পক্ষেই তিনি লেখেন, আমেরিকান নিগ্রো আর ভারতীয় হরিজনদের মধ্যে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। ভারতের হরিজনদের নিগ্রহের কথা আমেরিকার নিগ্রোদেরও মর্ম স্পর্শ করে এবং তখনই সেটি অনায়াসে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। তা যদি না হয় তা হলে হাজার দামামা বাজিয়েও কাউকে বিশ্বকবি বা বিশ্বশিল্পী

বানানো যায় না। দামামার শব্দ একদিন স্তব্ধ হয়ে যায়, বিশ্বশিল্পীর বাইরের মুখোসও খসে পড়ে।

তাই স্বাধীন শিল্পী, স্বাধীন লেখক হওয়া সহজ নয়। উৎকেন্দ্রতা, স্বৈরাচারীর দাসত্ব করা, স্বাধীনতা নয়। বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর সমস্ত ন্যায্য অধিকারের স্বাধীনতাই আসল স্বাধীনতা, আসল গণতন্ত্র। ফ্যাশিস্ট রাজত্বেও স্বাধীনতা থাকে, সামরিক একনায়কতন্ত্রেও স্বাধীনতা থাকে, ইমারজেন্সির সময়ও স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু কাদের জন্য সেই স্বাধীনতা? যারা ফ্যাশিস্ট-দের ও স্বৈরাচারীদের গোলামি করে, তাদের স্বাধীনতা। তারা কারা? সমাজের শতকরা দু'চারজন লোক। এই গোলামির স্বাধীনতা লেখকের জন্য নয়। লেখকের স্বাধীনতা যেহেতু সকল মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, তাই তাকে সেই স্বাধীনতা 'defend' করতে হয়, কারণ সেই স্বাধীনতা বিপন্ন হলে লেখাও বিপন্ন হয়। এমন ঐতিহাসিক অবস্থারও উদ্ভব হতে পারে এবং যখন হয় তখন কেবল কলম দিয়ে তাকে রক্ষা করা যায় না। 'A day comes when the pen is forced to stop, and the writer must then take up arms. Thus, however you might have come to it, whatever the opinions you might have professed, literature throws you into battle. Writing is a certain way of wanting freedom; once you have begun, you are committed willy-nilly.' (Sartre)*

এমন দিন যদি লেখকের জীবনে আসে যখন লেখনী ছেড়ে অস্ত্র ধরা ছাড়া উপায় নেই, তখন তাই তাঁকে করতে হবে, তাঁর নিজের স্বাধীনতা, তাঁর পাঠকদের ও বৃহত্তম মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। লেখার জন্য লেখা, আমার জন্য লেখা, চিরন্তন সত্যের জন্য লেখা, এসব আগডোম-বাগডোম কথার কোনো মূল্য নেই, ইতিহাসে নেই, মানুষের জীবনে নেই, মানুষের সমাজে নেই। 'চিরন্তন সত্য' ইত্যাদি চিরন্তন অত্যাচারী অমানুষদের মুখের বুলি।

* উদ্ধৃতিগুলি Jean-Paul Sartre-এর *What is Literature?* (London 1950) বই থেকে গৃহীত।

চার দশক আগে বর্তমান গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের কালে নানা পত্রে যে সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে সমসাময়িক প্রতিক্রিয়ার একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। নিচে এ রকম মাত্র তিনটি সমালোচনা নির্বাচন করা হয়েছে।

১

শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ (প্রথম খণ্ড): শ্রীবিনয় ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, অগ্রণী বুক ক্লাব, ৭বি যুগীপাড়া বাই লেন, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

সমসাময়িক আদর্শ সংঘাতে মানুষের মনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তাহার মানসিকতার ক্ষেত্রেই কেবল অস্বস্তিকর হইয়া উঠে নাই। তাহার বিশ্বাসের মূল ভিত্তিটা পর্যন্ত নাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এই অসুস্থ অনিশ্চয়তার মধ্যেও শ্রেণীস্বার্থের (সজ্ঞান না হইলেও) আকর্ষণ মানুষকে আদর্শ-বিশেষের প্রতি প্রবণ করিয়া তুলিতেছে। সে প্রবণতা আপাততঃ দ্বিধা-জটিল বলিয়া মনে হইলেও চরম সঙ্কট মুহূর্তে সকলেই নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থ-সংরক্ষণে সচেতন হইয়া উঠিতেছে এবং তজ্জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতেছে। এই শ্রেণীস্বার্থেরই সজ্ঞান বা নির্জন প্রেরণায় পৃথিবীর বহুসংখ্যক মানুষ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে মানবিক সম্বন্ধের নিরিখ নূতন করিয়া নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। জগৎব্যাপী এই স্বার্থ-সংঘাতের স্পর্শ হইতে কোন মানুষই বিমুক্ত নয়। এবং যে শিল্পীকে এতদিন মানসিকতার ক্ষেত্রে তুরীয় লোকবাসী বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, তিনিও যে শ্রেণীস্বার্থ সঞ্জাত আকর্ষণ বিকর্ষণের অতীত নহেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তাহাও আজ আর অস্পষ্ট নহে। শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে এই সচেতনতা পাশ্চাত্য শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছে এবং এই নব আদর্শসম্ভূত অন্তর্দৃষ্টির অসঙ্কোচ প্রকাশ এক বিপুল সমালোচনা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সাহিত্য কেবলমাত্র নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে শিল্প-সংস্কৃতির গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—দেশে দেশে শিল্প সংস্কৃতির নবজাগৃতিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার জন্য যে উদগ্র বিরুদ্ধতা প্রকট হইয়া উঠিয়া শিল্প সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে তৎসম্বন্ধে শিল্পীকে পথনির্দেশ দিয়া অনিবার্য সংঘাত

বিপর্যয়ে অবিচল থাকিবার প্রেরণা দিয়া এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়া শিল্পীর চক্ষুরুন্মীলনে সাহায্য করিতেছে।

আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে এ সম্বন্ধে সচেতনতা খুব বেশী নহে। বাঙ্গালার সমালোচনা সাহিত্যের অপ্রতুলতার মধ্যে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সাহিত্য বিচারের প্রয়াসও এতই অকিঞ্চিৎকর যে মাসিক পত্রিকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই চারিটা প্রবন্ধ ব্যতীত এ সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকখানিই যে ঐ সম্বন্ধে প্রথম ধারাবাহিক আলোচনা--একথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। কাজেই সেদিক দিয়া পুরোগামীর সম্মান বিনয়বাবুরই প্রাপ্য।

প্রথমে বলিয়া রাখি যে, গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থের সর্বত্র গভীর চিন্তাশীলতা, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, ভাবনার বলিষ্ঠতা ও ভাষার নিপুণতা অসাবধানী পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক হইতেও বটে আর মার্ক্সীয় শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রথমাগত বলিয়াও বটে বিস্তৃত সমালোচনার দাবী রাখে। কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রে স্থানের অপ্রাচুর্য সে-দাবী পরিপূরণের অনুকূল নহে। কাজেই আমরা গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুর একটা অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার ও বিশ্লেষণের দার্শনিক ভিত্তি হইল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। এই দর্শনে মূল কাঠামোটি গড়িয়াছিলেন দার্শনিক হেগেল। মার্ক্স তাঁহার সেই কাঠামোর ভাবপ্রধান আবরণটিকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র পদ্ধতিটা গ্রহণ করেন এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় তাহাকে ঢালিয়া সাজেন! লেখক প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে অথচ স্বচ্ছভাবে এই মার্ক্সীয় দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন এবং হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে তার পার্থক্যটাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ প্রুধোঁ ও ফয়েরবাখের সঙ্গে তাঁহার যে বিরোধ কোথায় তাহার ইঙ্গিতও লেখক করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি হেগেল, ক্রোচে ও কার্ল মার্ক্সের শিল্প-বিশ্লেষণধারার আলোচনা করিয়া মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে,—"শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ যেখানে বর্তমান, সেখানে শ্রেণী-শিল্প (Class Art) ভিন্ন অন্য কিছু বিকশিত হোতে পারে না এবং শিল্পী যদি তাঁর যুগ-সমস্যার প্রতি ও যুগাদর্শের প্রতি

নিষ্ঠাবান হন, সত্যকার শিল্পীকে হোতেই হবে,—তাহলে তিনি সেই যুগে প্রগতিপন্থী।"

ইহার পরবর্তী 'সত্য ও বাস্তব', 'কাব্য', 'কাব্যের ক্রমবিকাশ', 'উপন্যাস', 'উপন্যাসের ঐতিহাসিক ধারা'—এই কয়টি অধ্যায়ে শিল্পের উপাদান, তাহার পরিপ্রকাশ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার অভিব্যক্তির ধারা, শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা প্রভৃতি সম্বন্ধে এত নিপুণতার সঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়েই লেখকের বলিষ্ঠ মননশীলতা, বিস্তৃত অধ্যয়ন ও আদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতা এত স্পষ্ট যে পাঠক মাত্রেই উহা হইতে চিন্তার প্রচুর খোরাক সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়ে 'আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয় পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। এই দুইটি অধ্যায়ে লেখক শক্তির পরিচয় দিলেও উহা অপ্রচুর বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। দুটি বিষয়ই বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

'সংস্কৃতি-সঙ্কটের রূপ', 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সমাজ' ও 'আমাদের কর্তব্য'—শেষের এই তিনটি অধ্যায়ে শিল্প ও সংস্কৃতি আজ যে সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত আলোচনা এবং তাহার নিদান নির্ণয়ের সক্ষম প্রচেষ্টা আছে। শিল্পে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কি ভূমিকা সে সম্বন্ধে ইঙ্গিতও স্পষ্ট ও সুচিন্তিত। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংবাদিকের কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ও নিঃসংশয় নির্দেশ দিয়া লেখক গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থশেষে যে প্রমাণ-পঞ্জী দেওয়া হইয়াছে, তাহা সুনির্বাচিত। গ্রন্থে আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনেচ্ছু পাঠক উহা হইতে সহায়তা লাভ করিবেন। গ্রন্থমধ্যে যে সমস্ত গ্রন্থকারের মতামত আলোচিত হইয়াছে, গ্রন্থশেষে তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্ট গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

লেখকের ভাষার স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা সত্ত্বেও দুই তিনটি স্থানে আলোচনা আমাদের কাছে অস্পষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছে। সক্ষমের এ ত্রুটি উপেক্ষণীয় নহে। কয়েকটি বাঙ্গলা পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধেও আমাদের আপত্তি আছে। স্থানে স্থানে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও বিরোধী মতাবলম্বীর প্রতি রূঢ় শব্দ প্রয়োগ মনকে পীড়া দেয়। আলোচ্য গ্রন্থে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে প্রধানতঃ উপাদান

সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন বলিয়া গ্রন্থকার আশ্বাস দিয়াছেন।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল, বাঁধাই স্থায়ী ও রুচিসঙ্গত।*

—আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার ২৩ জুন ১৯৪০, পৃষ্ঠা ১৭

২

শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ, প্রথম খণ্ড, বিনয় ঘোষ। অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা সাহিত্যের পরিধি যে এ যুগে বিস্তৃততর হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহার প্রমাণ আছে। লেখক বিনয় ঘোষ চিন্তাশীল সমাজের দৃষ্টি ইতিমধ্যেই আকর্ষণ করিয়াছেন। বয়সে তরুণ হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ, অধিকন্তু তাঁহার বাচনভঙ্গী চমৎকার। এ সব কটি গুণ মিলিয়া আলোচ্য বইখানি উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। এই বইখানি যাঁহারা মন দিয়া পড়িবেন, তাঁহারা লেখককে এক নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তক বলিয়া স্বীকার করিবেন। বর্তমান যুগের বাংলা দেশের সমাজ ব্যবস্থার পটভূমি হইতে তিনি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিচার করিয়াছেন। ইহাতে শিল্পের স্বরূপ বিশ্লেষণ, সত্য ও বাস্তব, কাব্য, উপন্যাস, মধ্যবিত্তশ্রেণী ও সমাজ প্রভৃতি আলোচনা আছে। প্রত্যেকটি আলোচনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সকল সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাও নিপুণভাবে দেখানো হইয়াছে। আমরা সাগ্রহে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।

—শনিবারের চিঠি : কার্তিক ১৩৪৭, ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৫২

৩

This is an ambitious book in Bengali which aims at giving a summary of the relations of art, culture and society. The aim and courage of the author is praiseworthy. But anyone who knows English and read will find this not only superfluous but inaccurate and confused. As for a reader who knows no English, the book is too pedantic.

—*The Sunday Statesman*, August 4, 1940

* এই সমালোচনা সম্প্রতি-পরলোকগত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ লিখেছিলেন। —লেখক।

গ্রন্থপঞ্জী

Karl Marx : The Poverty of Philosophy
V. I. Lenin : Materialism and Empirio-criticism
F. Engels : Anti-Duhring
J. Stalin : Foundations of Leninism
T. A. Jackson : Dialectics
Sidney Hook : From Hegel to Marx



T. S. Eliot : After Strange Gods
T. S. Eliot : Selected Essays
Ezra Pound : A. B. C. of Reading
Ezra Pound : Make it New
Oswald Spengler : Decline of the West
Oswald Spengler : The Hour of Decision
H. G. Wells : Experiment in Autobiography (2 vols)
H. G. Wells : The Fate of Homo Sapiens
H. G. Wells : The New World Order
Sigmund Freud : Beyond The Pleasure Principle
Sigmund Freud : Civilisation and its Discontents
Sigmund Freud : The Future of an Illusion
Dr. Ernest Jones : Psychoanalysis
G. D. H. Cole : What Marx Really Meant



Benedetto Croce : Æsthetic
Lascelles Abercrombie : Principles of Literary Criticism
Bertrand Russell : Education and The Modern World
Henry Levy : A Philosophy for a Modern Man
Leon Trotsky : Literature and Revolution
Max Eastman : Artists in Uniform
Wyndham Lewis : Men without Art
C. Day Lewis Mind in Chains
Philip Henderson Literature

John Strachey		The Coming Struggle for Power
Samuel D. Schmalhausen		The New Road to Progress
Christopher Caudwell		Illusion and Reality
Christopher Caudwell		Studies in a Dying Culture
Ralph Fox		The Novel and the People
James T. Farrell	.	A Note on Literary Criticism
Stephen Spender	:	The Destructive Element
Alec Brown	:	The Fate of the Middle Classes
Romain Rolland	:	I Will Not Rest
Amedee Ozenfant	:	Journey Through Life
I. A. Richards	:	Science and Poetry



Left Review
International Literature
New Writing

১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে প্রকাশিত কয়েকখানি উল্লেখ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা :

S. Baxandall : Marxism and Aesthetics : a selective annotated bibliography : New York 1968

Baxandall and Marawski(ed) : Marx and Engels on Literature and Art : St. Louis 1973

Raymond Williams : Marxism and Literature : London 1977

L. Goldmann : Towards a Sociology of the Novel : London 1975

A. Gramsci : Prison Notebooks : London 1970

G. Lukacs : The Historical Novel : London 1962
The Theory of the Novel : London 1971

H. Marcuse : The Philosophy of Aesthetics : N. Y. 1972

New Left Review

Socialist Register.

—